The Prophet Jesus (AS) will return

by HarunYahya – Adnan Oktar

হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

অনুবাদ:

এ.এন.এম. এ মোমিন

:: সূচীপত্র ::

- ভূমিকা ৪
- হযরত ঈসা (আঃ) সকল পয়গম্বরদের মত ৫
- আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ৮
- একজন ত্রাণকর্তার জন্য বিপদগ্রস্থ লোকদের প্রার্থনা ১৪
- হযরত মরিয়ম (আঃ) এর পুত্র পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা ২৩
- হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ৬৪
- হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে আল হাদীস ৮৭
- হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে দ্বিতীবার আগমন সম্পর্কে রিসালত আল নূর এর বর্ণনা ১০১
- হযরত ঈসা (আঃ) এর পরিচয় ১৩৩
- উপসংহার ১৫১

হযরত ঈসা (আঃ)

এর

প্রত্যাবর্তন

ভূমিকা:

যখন ফেরেশতাগন বলিলেন,

হে মরিয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হতে এক কলেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাঁহার নাম মসীহ্, মরিয়াম তনয় ঈসা (আঃ)। সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত ও নৈকট প্রাপ্তগণের মধ্যে অন্যতম হইবে।

(সুরা আল ইমরান–৪৫)

হযরত ঈসা (আঃ) সকল পয়গম্বরদের মত

হযরত ঈসা (আঃ) সকল পয়গম্বরদের মত আলাহ্তালার একজন বান্দা, যিনি আল্লাহর নির্দেশে তাঁর বান্দাগণকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করতেন। আলাহ্ তালা হযরত ঈসা (আঃ) কে বিশেষ ধরনের গুনাবলী প্রদান করেছেন যা অন্যান্য নবী/রাসূল(সঃ)কে দেওয়া হয় নাই। এ সব গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁকে আল্লাহ্তালা উর্ধ জগতে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করবেন।

অধিকাংশ লোকের প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত কথাটি হলো যে হযরত ঈসা (আঃ)কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় নাই বা তাঁকে হত্যাও করা হয় নাই। অথবা যে কোন কারনেই হোক না কেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যা করে নাই। তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই এবং আল্লাহতালা তাঁকে উর্ধ জগতে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন। তাছাড়া পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এমন সব ঘটনার অবতারনা করা হয়েছে যেগুলি এখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। এ কারনে পৃথিবীতে তার দ্বিতীয়বার আগমন এই সমস্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী অবশ্যই সংঘটিত হবে।

রাসূল (সঃ) এর হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর সান্নিধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করবেন। আর যখন তিনি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন, তখন তিনি কোরআন দ্বারা সমগ্র বিশ্ব শাসন করবেন। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বস্ত ইসলামী ধর্মীয় ভাবধারায় পরিচালিত হবে। তিনি এবং ইমাম মাহদী (আঃ) একত্রে সমগ্র বিশ্ব ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধ এর মাধ্যমে শাসন করবেন।

সকল বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত পোষন করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা যান নাই এবং তিনি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক ধারনা করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, তাই তাঁর পৃথিবীতে আগমনের আর কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রকৃতপক্ষে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই বিভ্রান্তিকর ধারনার মূল কারন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আখেরী জমানায় হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। সেই সময় সমগ্র বিশ্বে নজীরবিহীন শান্তি, ন্যায়বিচার ও কল্যান বিরাজ করবে।

আখেরী জমানা বলতে সেই সময়কে বুঝিয়ে থাকে যার কিছুদিন পরে পৃথিবী ধ্বংস হবে। ইসলাম ধর্মমতে ঐ সময়ে বিশ্ববাসী দজ্জাল তথা AntiChrist এর ভয়াবহ ও কঠোর নির্যাতনের শিকার হবে। পৃথিবীতে ঘন ঘন ভূমিকম্প, ইয়াজুজ ও মাজুজের (Gog & Magog) আবির্ভাবের পর কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষার প্রাধান্য বজায় থাকবে এবং জনগন কোরআনের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) মারা যান নাই, তা বিদ্যমান প্রমানাদির মাধ্যমে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে। বরং তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। এই পুস্তকে পবিত্র কোরআন, হাদীসের ধর্মীয় চিন্তাবিদগণের বক্তব্যের আলোকে করা হবে। যাহোক, মূল বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের কয়েকটি বিষয় স্মরন ও বিবেচনায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম

আলাহ্ সকল জনগোষ্ঠির কাছেই নবী ও রসুল (সঃ) প্রেরণ করেছেন। আলাহ্তালা এই নবী রসুল (সঃ) কে আলাহ্র পথে চলার জন্য জনগনের কাছে আহ্বান জানাতেন। বর্তমানে অনেকে মনে করে থাকেন যে, বিভিন্ন নবী ও রসুলগণ মানব জাতির কাছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মমত প্রচার করেছেন। এটি একটি বিভ্রান্তিকর ধারনা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তালা বিভিন্ন জনগোষ্ঠির কাছে ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং এক এবং শুধুমাত্র একটি ধর্ম প্রচার করার জন্য নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট যে সব ধর্মীয় বিধানসমূহ দেয়া হয়েছিল, তার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিধি বিধানের কয়েকটি বাতিল করা হয়েছিল। তবে নীতিগতভাবে আল্লাহ্র প্রেরিত ধর্মের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। পূর্ববর্তী নবী ও রসুলগণ (সঃ) এর নিকট যে ধর্মমত নাজিল করা হয়েছিল তা আল্লাহ্র মনোনীত ও নির্বাচিত ধর্মমত তা অবশ্যই ইসলাম ধর্ম।

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ঃ

"আমরা আলাহ্র উপর এবং তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ন হইয়াছে অর্থাৎ ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মুসা, ঈসা, ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে। তাহাতে ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পনকারী। কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভূক্ত হবে।

(সুরা আল ইমরান ৮৪ –৮৫)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতসমূহ প্রমান করে যে, সকল জনগোষ্ঠির কাছে সত্য ধর্ম ইসলামই নাজিল করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্ম প্রচারকগণ একটি মাত্র ধর্মই প্রচার করেছেন, আর সেটি হলো ইসলাম। কোরআনের অন্য একটি আয়াতে উলেখ করা হয়েছে, আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম (সুরা মায়িদা–৩)। আল্লাহতালা তার নবী ও রসুলগণের মাধ্যমে এই ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন এবং এ ধর্মের উপরই তাঁর সন্তুষ্টি রয়েছে ও সকল ধর্ম প্রচারকগণ এই ধর্মই শিক্ষা দিয়েছেন। প্রতিটি লোক যার কাছে এই ধর্মের বাণী পৌঁছাবে এটি প্রতিপালন বা অনুসরন করা তার জন্য অবশ্য দায়িত্ব। আলাহর ধর্ম কোন কোন জনগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে, আবার অনেক জনগোষ্ঠি তা গ্রহণ করেনি। আবার কোন এলাকার নবী রসুলগণের মৃত্যুর পরে এই ধর্ম বিকৃত হয়ে ভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে:

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর একমাত্র দ্বীন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষঃবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর কেহ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করিল, আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

(সুরা আলে–ইমরান–১৯)

বনি ইসরাইল গোষ্ঠির একটি শাখা ছিল এমন এক জনগোষ্ঠি যারা সত্যপথ প্রাপ্তির পর বিভ্রান্ত বা সত্য পথচ্যুত হয়ে পড়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি বনি ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর কাছে অনেক নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ সেই পয়পম্বরদের বিরুদ্ধাচারন করেছে অথবা সেই পয়গম্বরের মৃত্যুর পর তারা সঠিক ধর্মমত ও পথ পরিবর্তন করে বিকৃত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু,

আমরা কোরআনের মাধ্যমে জানতে পারি, তখন হযরত মুসা (আঃ) জীবিত থাকাকালীন সময়ে কিছু কিছু লোক তার অল্প দিনের অনুপস্থিতিতে সোনার বাছুর বানিয়ে তা পূজা করেছে (সুরা ত্বাহা ৮৩ -৮৪)। আলাহ্তালা হযরত মুসার (আঃ) মৃত্যুর পর বনি ইসরাইলীদের কাছে অনেক পয়গম্বর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য পাঠিয়েছেন। এই ধারায় সর্বশেষ নবী হলেন হযরত ঈসা (আঃ)। হযরত ঈসা(আঃ) আজীবন তাঁর গোত্রের কাছে আল্লাহর পাঠানো এই ধর্মমত প্রচার করে তাদেরকে আলাহ্র প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য বলেছেন। তিনি তাদেরকে পবিত্র ইনজিল কিতাবের নির্দেশনাবলী প্রতিপালন করতে বলেছেন। সেই ইনজিলের কিছু অংশ বর্তমানেও এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট নাজিলকৃত ইনজিল তাওরাতের (Torah) উল্লেখিত নির্দেশনাবলীসমূহ প্রত্যয়ন করে। বর্তমানে Old Testament এর মধ্যে তাওরাতের কিছু অংশ বিদ্যমান রয়েছে, যা হযরত ঈসা (আঃ) সময়ে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) রাব্বিদের (ইহুদী ধর্মীয় নেতা) ভুল ধর্মীয় শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করেন এবং তাদের প্রনীত ও প্রবর্তিত অনেক ধর্মীয় বিধিবিধান, যা তাদের ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করতো - বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি বনি ইসরাইলীদের আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, সত্যবাদিতা ও পুন্যবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন, যা আমরা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানতে পারি। তিনি বলেন:

“আর আমি আমার সম্মুখে তাওরাতের মধ্যে যাহা রহিয়াছে, উহার সমর্থক রূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরন কর।

(সুরা আল ইমরান– ৫০)

হযরত ঈসা (আঃ) এর অন্তর্ধানের পর তাঁর পরবর্তী অনুসারীরা নাজিলকৃত ধর্মমতের ব্যপক বিকৃতি সাধন করে। তারা পৌত্তলিক গ্রীকদের বিকৃত ধর্মমত থেকে কিছু বিকৃত ধ্যান ধারনার অনুসারী হয়ে তারা Trinity বা ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ভাবধারা বা মতবাদ (আলাহ্ যা থেকে মুক্ত) চালু করে, যা বর্তমানে খৃষ্টবাদ বা Christianity নামে পরিচিত। যদিও বর্তমানে খৃষ্টবাদের মধ্যে মূল ধর্মের কিছু বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানাদি চালু আছে, তবে হযরত ঈসা (আঃ) এর অর্ন্তধানের পর কিছু লোক এই ধর্মমতকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন সংশোধন ও বিকৃতি সাধন করে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রথম আগমনের দীর্ঘ বছর পর কিছু অজ্ঞাত পরিচয়নামা ব্যক্তি গ্রীক ভাষায় New Testament নামক পুস্তক রচনা করে। যদিও হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ভাষা ছিল Aramic, যা আরবী ভাষার কাছাকাছি একটি ভাষা এবং ইনজিল কিতাব এই ভাষায়ই নাযিল করা হয়। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণ ঐ সব লেখা একত্রিত করেন, যা বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মের ভিত্তি হিসাবে প্রচলিত। তাই খৃষ্টবাদ বা প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম হযরত ঈসা (আঃ) এর মূল শিক্ষা থেকে বহুদূরে চলে গেছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পর আল্লাহতালা অন্য একটি গোত্রের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করেন, যার মধ্যে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা মানব সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী দান করেন। এই নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আর এই ঐশী গ্রন্থ হলো কোরআন, যা পৃথিবীর একমাত্র ঐশী বাণী যা সকল প্রকার বিকৃতি, বিচ্যুতি ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত।

পবিত্র কোরআন সকল সময়ের মানব জাতির জন্য হেদায়েতকারী ঐশী গ্রন্থ। প্রত্যেক যুগের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হলো এই মহাগ্রন্থকে মান্য ও অনুসরন করা। শেষ বিচারের দিনে মানব জাতির কার্যকলাপ (আমল) এই কোরআনের নিরীখে বিচার করা হবে। বর্তমান বিশ্ব আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ছোট হয়ে গেছে এবং যেন একটি বিশ্বগ্রামে পরিনত হয়েছে। তাই কোরআন ও এর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বা কোরআনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর থাকা কারো পক্ষেই আর সম্ভব নয়। তবুও পৃথিবীর মাত্র কিছু অংশের লোক কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস ও মান্য করে থাকে।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হযরত ঈসার (আঃ) পুনরাগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা করে বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মে যে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি রয়েছে তার সমাধান করবেন। এই পুস্তকের পরবর্তী পরিচ্ছদে এ বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তিনি শারীরিকভাবে মৃত্যু বরনও করেন নাই। হাদীসে বলা আছে যে, তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে একযোগে ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই কারনে মুসলিম ও খৃষ্ট বিশ্ব অধীর আগ্রহে এই পবিত্র আশীর্বাদপুষ্ট মহান অতিথিকে পৃথিবীতে পুনঃ আগমন করার সাথে সাথে নাযাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

একজন মুক্তিদাতা বা ত্রানকর্তার জন্য বিপদগ্রস্থ লোকদের প্রার্থনা

তোমাদের কি হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যাহারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, এই জনপদ– যাহার অধিবাসী জালিম/সীমালংঘনকারী, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও, তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ কর এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে সহায়তা কর।

(সুরা নিসা–৭৫)

কোরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন রাসূল বা পয়গম্বর প্রেরনের পূর্বে সমাজে প্রচলিত, নৈতিক অবক্ষয় এক চুড়ান্ত আকার ধারন করে। তখন কোন পয়গম্বর সমাজে আগমন করেন। তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে সংগ্রামরত থাকা সত্ত্বেও একটি সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধশালী জীবন যাপন করে। এই আর্শীবাদপুষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক লোক, এই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আবার কেহ কেহ বিদ্রোহ ঘোষনা করে খোদাদ্রোহিতা বা নাস্তিক্যের পর্যায়ে উপনীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাস্য স্থির করে নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে মহা বিভ্রান্তির শিকার হয়।

আলাহ্তালা পবিত্র কোরআনে তাঁর প্রতিনিধি নবী ও রাসূলদের তাঁর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্থতা, আন্তরিকতা সর্বোপরি তাদের খোদাভীরুতার প্রশংসা করে কিভাবে তাদের নবী পরবর্তী প্রজন্ম ঈমানহারা হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যখন তাদের খেয়াল-খুশী, লোভ, লালসা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার ফলে তারা নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বহুদুরে চলে যায়।

এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ননা করা হয়েছে ঃ

ইহাই তাহারা, নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আদমের বংশ হইতে ও যাহাদিগকে আমি নুহের সহিত নৌকায় আরোহন করাইয়াছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসমাইলের বংশোদ্ভুত ও তাহাদিগকে আমি পথ নির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট দয়াময়ের নিকট হইতে কিছু আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে। উহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ। যাহারা সালাত বিনষ্ট করল ও তাদের লালসা প্রবল হইল। সুতরাং অচিরেই উহারা তাহাদের কু–কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

(সুরা মরিয়াম ৫৮–৫৯)

আলাহ্‌ প্রদত্ত ঐ দায়িত্ব পালনে যে সমস্ত লোক অবহেলা করেছে, তারা আল্লাহতালার ক্রোধের বা গজবের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগের আকারে যা তাদের জীবনে প্রবেশ করে তাদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। তারা আল্লাহর কৃপা বা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, যে আমার স্মরনে বিমুখ থাকিবে, অবশ্যই তাহার জীবন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায় (সুরা- ত্বহা-১২৪)। তাই তারা বিভিন্ন ধরনের দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হবে যেমন দ্রব্য সামগ্রীর দুস্প্রাপ্যতা, অভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বা নৈতিক ক্ষয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সৃষ্টি হবে। ধর্মবিহীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যারা ঐশী নির্দেশনা তথা ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদ্ধত আচরন করে, তারা বিভিন্ন ধরনের অবিচার, চাপ ও নির্যাতনের শিকার হয়। কোরআনে বর্ণিত ফিরাউনের সময়কালের সামাজিক নির্যাতন এমন পরিস্থিতির একটি বাস্তব উদাহরণ। ফিরাউন তার পার্থিব বিজয়ের ও শক্তির গর্বে উম্মত থাকতো এবং

অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো। অন্যদিকে তার প্রজা সাধারন তার একনায়কতন্ত্রের চাপে এক দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য হতো। কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

ফিরাউন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের একটি শ্রেনীকে সে হীনবল করিয়াছিল। উহাদের পুত্র সন্তানগণকে সে হত্যা করিত এবং কন্যা-সন্তানকে জীবিত থাকিতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

(সুরা আল কাসাস–৪)

এ ধরনের পরিস্থিতিতে জনগণ তার জুলুমবাজ নেতৃত্বের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় পতিত হয়। তখন একজন ত্রানকর্তার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। খোদার নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা ও ধর্মীয় বিচ্যুতির কারণে সমাজ ব্যবস্থায় যে অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, অবিচার ও অনাচার সৃষ্টি হয় এই ত্রানকর্তা তা অপসারন করে জনগণকে আলাহ ও তার রাসূলের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা বিধান করেন।

হযরত মুসা (আঃ) এর পরবর্তী যুগে বনি ইসরাইলগণ তাদের স্বৈরশাসক নেতাদের জুলুম ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিলেন। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বহিস্কার করা হয়। তাদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হয় এবং তারা সকল ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অতি কষ্টে কালাতিপাত করতে থাকেন। যে সব উপাস্য তারা নির্বাচন অথবা নির্ধারন করছেন তা অথবা তাদের ধনসম্পদ অথবা তাদের মহান পূর্বপুরুষগণ তাদের কোন উপকারেই আসে নাই - এ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করার পর বনি ইসরাইলগণ আল্লাহতালার পক্ষ থেকে একজন রাজা তথা

ত্রানকর্তা প্রেরনের জন্য প্রার্থনা করে, যিনি তাদেরকে এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার বা মুক্ত করবেন।

আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন নাই:

কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষন করে আমরা দেখতে পাই যে, অতীতের সকল সভ্যতাই তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করেছে এবং সকলকেই একই ধরনের দুর্ভাগ্য বরন করতে হয়েছে। এই সব সভ্যতার জনগণ যে ধরনের লাগামহীন জীবনযাপন করেছে তাই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্‌ নবী রসুল প্রেরণ করেছেন এবং তারা তাদের পয়গম্বরদের প্রদর্শিত জীবনযাত্রা অস্বীকার করেছে বা তাঁর অবাধ্য হয়েছে তাদের একই ধরনের প্রক্রিয়ায় উৎখাত বা ধ্বংস করা হয়েছে।

আধুনিক সমাজব্যবস্থায়ও অতি দ্রুত ব্যাপকভাবে দুর্নীতি, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে। দারিদ্র, দুঃখকষ্ট ও সামাজিক বিশৃংখলা তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই তারা শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক জীবন, অর্থাৎ যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ, ন্যায় বিচার ও পূণ্য বিরাজ করবে এমন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রচন্ডভাবে আগ্রাহন্বিত হয়ে পড়েছে। কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধ যে সমাজে বিরাজমান থাকে সেই সমাজে কেবল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বর্তমান সমাজের সকল ধরনের অবিচার, অন্যায় ও দুঃখ-কষ্ট দূর করার একমাত্র পথ হলো সঠিকভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ধর্মীয় নৈতিকতা ও পূন্য বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতিতেই আল্লাহতালা পূর্ববর্তী সভ্যতা সমূহে নবী বা রাসূল প্রেরণ করে সেই জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন। আল্লাহতালা কখনও কখনও তাদের প্রতি অযাচিত কৃপা ও করুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের ভয়াবহ সামাজিক নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ব্যাপারটি কোরআনের ভাষায় ঃ

যদি সেই সকল জনগণের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনয়ন করিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল কল্যান উম্মুক্ত করিতাম। কিন্তু তাহারা তা প্রত্যাখান করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি

(সুরা আল আরাফ–৯৬)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, আল্লাহতালার নিকট থেকে দোয়া ও করুনা, শান্তি প্রাপ্তির একটি এবং শুধুমাত্র একটিই পদ্ধতি রয়েছে তা হলো– ইসলামকে পুর্নাঙ্গ ও নিবিড়ভাবে অনুসরন করা বা মেনে চলা। পূর্ববর্তী সমাজে যেমন এই বিধান চালু ছিল, তা বর্তমান এবং অনাগত সকল সভ্যতার জন্য এটি সমভাবে প্রযোজ্য হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে থাকবে। ইসলামের জীবন দর্শন থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠি অবশ্যই অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হবে। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান। আর এই আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন নাই, যা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে:

কিন্তু ইহাদের নিকট যখন পয়গম্বর আসিল, তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল। পৃথিবীতে উদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবেনা।

(সুরা ফাতির ৪২–৪৩)

কোরআন অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম পালন:

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহতালা জনগণকে নাস্তিক্যতাবাদ ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে নবী রসুল প্রেরণ করেন। এই পয়গম্বরগণ তার জনগণকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন, খোদাভীতি, ঐশী প্রেম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই জনগোষ্ঠী যদি আল্লাহর রসুলের শিক্ষা অনুসরন করতে অস্বীকৃতি প্রদানে বা তাঁকে অমান্য করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাহলে সেই নবী বা রাসূল আলাহর ক্রোধ বা শাস্তির ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। আল্লাহতালা কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহতালা কোন জাতিকে সতর্ক না করে তাদের কোন শাস্তি প্রদান করেন নাই বা ধ্বংস করেন নাই।

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিলনা। ইহা উপদেশ স্বরূপ, আর আমি অন্যায়কারী বা জুলুমবাজ নই।

(সূরা আস শুয়ারা– ২০৮-২০৯)

বর্তমানে আমরা যে যুগে বসবাস করছি সেই সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক অধঃপতন দেখতে পাওয়া যায়। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান পীড়াদায়ক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামাজিক অনাচার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব ঘটবে। আল্লাহর মনোনীত সত্য ধর্মই সমস্ত বিশ্বে বিজয়ী হবে ও অন্যান্য সকল অধর্ম বাতিল হয়ে যাবে। সত্যিকার মুমিন বান্দাদের আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনে এরই সুসংবাদ প্রদান করেছেন ঃ

তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য তিনি পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

(সুরা ওবা-৩২-৩৩)

আলাহ্‌তালা পবিত্র কোরআনের সুরা নূর এ প্রকৃত ঈমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যারা আল্লাহর একত্বের প্রতি অবিচল থেকে সৎকর্মে নিবেদিত থাকে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে থাকে, তবে তাদেরকে ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হবে যেমনটি অতীতেও করা হয়েছিলো ঃ

তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তী দিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন তাহাদের দ্বীনকে, যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে। আমার কোন শরীক করিবে না। অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

(সুরা নূর–৫৫)

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত থেকে আমরা ইসলাম প্রচারের পূর্বশর্ত জানতে পারলাম, আর তা হলো সমাজে এমন ধরনের ঈমানদারদের উপস্থিতি যারা শিরকবিহীন ইবাদতে নিবেদিত হয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সৎকর্ম করে থাকে।

ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহতালা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের ঠিকই সাহায্য করে থাকেন, যারা তাঁর সাহায্যের প্রকৃত প্রত্যাশী বা যাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয়স্থল হলো শুধুমাত্র আল্লাহতালা। এই আমোঘ বিধান অতীতে যেমন কার্যকর ছিল, বর্তমানে তেমনি কার্যকর রয়েছে, ভবিষ্যতেও একইভাবে তা কার্যকর থাকবে। আল্লাহতালা বর্তমান সমাজে খোদাদ্রহিতার আলোকে সৃষ্ট অনাচার অবিচার থেকে তাঁর বান্দাদের অবশ্যই রক্ষা করবেন।

ইসলামিক বিশ্ব বর্তমানে যে বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে রয়েছে তা থেকেও আল্লাহ উদ্ধার করবেন। হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারে তা সন্নিকটে। প্রত্যেক যুগের মত এ যুগেও লোকে বিশ্বাস করে যে, তাদের উদ্ধারের জন্য একজন ত্রানকর্তা আগমন করবেন। এই ত্রানকর্তা যিনি মানব জাতিকে পাপ–পংকিল অন্ধকার জগত থেকে উদ্ধার করে পূন্যময় আলোকজ্জল পথে নিয়ে যাবেন। আর এই পথ হলো ইসলাম। হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী (আঃ) যারা উন্নত জীবন যাপনের মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে যে সব খোদাদ্রোহিতার মতবাদ ইজম বা তত্ত তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সেগুলো ধ্বংস করবেন।

আলাহতালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা প্রকৃতপক্ষে আলাহর সাহায্য কামনা করে, তাঁকে ভালবাসে, ভয় করে, তাদেরকে তিনি সাহায্য করে থাকেন। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

“তাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারনে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আলাহ। আলাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃষ্টান সংসার, বিরাগীদের উপাসনা স্থান গির্জা,ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ ,যাহাতে অধিক স্মরন করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী”

(সুরা হজ্জ ৪০–৪১)

পবিত্র কোরআনে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর পুত্র পয়গম্বর ঈসা (আঃ) এর বর্ণনা

এই পরিচ্ছদে হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসব তথ্যাদির প্রথম ও প্রধান উৎস হলো অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয় আলাহর বাণী পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে:

"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বানী পরিপূর্ণ। "তাহার বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"

(সুরা আল–আনআম: ১১৫)

আর দ্বিতীয় উৎস হলো আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র মুখে নিঃসৃত বানী হাদীসে রসুল।

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহতালার একজন বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট পয়গম্বর, যিনি প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে অবস্থান করছিলেন। কোরআনে তিনি ইহ্কালে ও পরকালে অতি মর্যাদাশীল হিসাবে বিবেচিত। তাঁর নিকট আল্লাহ্র সত্যধর্ম নাজিল করা হয়েছিল যা অদ্যাবধি নামে মাত্র হলেও টিকে আছে। হযরত ঈসা (আঃ) এর মূল ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর কাছে নাজিলকৃত ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জিলও বিকৃত, সংশোধিত ও সংযোজিত করা হয়েছে। খৃষ্টান পন্ডিতগণ এই মহা বিকৃতির কাজটি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এ কারণে খৃষ্টান উৎস থেকে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সার্বিক তথ্য পাওয়ার কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই।

আল্লাহ্র নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রকৃত ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তির একমাত্র উৎস হলো কোরআন, যে পুস্তকের কেয়ামত পর্যন্ত সঠিকতা ও অবিকৃত থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্কে স্বয়ং নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং সুন্নাহ অর্থাৎ রসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বানী। কোরআনে আল্লাহতালা হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম ও জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কিছু ঘটনা তিনি পৃথিবীতে তার অবস্থানকালীন সময়ে সংঘটিত হয়েছে এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক নিকটতম লোকজন ও তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া কোরআনে হযরত মারিয়ম (আঃ) এর জীবনী, হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পূর্বের ঘটনা, কি অলৌকিক পদ্ধতিতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) কে গর্ভে ধারন করেছিলেন, এই ঘটনায় তাঁর পারিপার্শ্বিক লোকজন কি প্রতিক্রিয়া দেখায়, এই ঘটনার সার্বিক রহস্য ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্ত কোরআনের কোন কোন আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে

দ্বিতীয়বার আগমনের ইংগিত রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে কোরআনে বর্ণিত এসব বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মরিয়ম (আঃ) এর জন্ম ও প্রতিপালন ঃ

হযরত মরিয়ম (আঃ)কে হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা হওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। হযরত মরিয়ম (আঃ) একটি বিশৃংখলাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহতালা হযরত মরিয়ম (আঃ) কে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছিলেন এবং সেই ভাবেই তাঁকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ইমরান (আঃ) এর পরিবারটিকে আল্লাহতালা স্বয়ং সমগ্র বিশ্বের জনগনের মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মনোনীত করেছেন। এই পরিবারের সদস্যবৃন্দ খোদাভীরুতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তারা সকল কাজে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ছিল এবং অতি সতর্কতার সাথে আলাহর বিধি বিধান অনুসরন করতো।

যখন হযরত ইমরান (আঃ) এর স্ত্রী যখন জানতে পারলেন যে, তিনি সন্তানসম্ভবা, তখন তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তার দরবারে অনাগত সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবেন মর্মে মানত করলেন। বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ

স্মরন করো, যখন ইমরান এর স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যাহা আছে, তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি, আমার নিকট হইতে উহা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। অতঃপর যে উহাকে প্রসব করল, তখন সে বলিল, আমার প্রতিপালক, আমি কন্যা প্রসব করিয়াছে। সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত। আর ছেলে তো মেয়ের

মত নয়। আমি উহার নাম মরিয়াম রাখিয়াছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার স্মরন লইতেছি

(সুরা আলে ইমরান ৩৫–৩৬)

যখন হযরত মরিয়ম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, ইমরান (আঃ) এর স্ত্রী শুধুমাত্র আলাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে হযরত মরিয়ম (আঃ)কে শয়তানের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য আলাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন, আলাহ্‌র প্রতি তার একাগ্রতা ও আন্তরিকতার পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ হযরত মরিয়ম (আঃ)কে মহৎ ও পূণ্যবর্তী হওয়ার সকল গুনাবলী দান করেন।

কোরআনে আল্লাহতালা, হযরত মরিয়ম (আঃ) কিভাবে প্রতিপালিত হন, কিভাবে অতি সতর্কতার সাথে তাঁকে রক্ষনাবেক্ষণ করেন তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে:

অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাহাকে উত্তমরূপে কবুল করলেন এবং তাহাকে উপযুক্তরূপে শারীরিক সৌন্দর্য ও মানসিক উৎকর্ষ দিয়ে লালন পালন করিলেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত মরিয়াম (আঃ) এর অভিভাবক হন। যখনই হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর সাথে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হতো, তিনি বুঝতে পারতেন যে, আল্লাহতালা হযরত মরিয়ম (আঃ) কে অসাধারন গুণাবলী সম্পন্ন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া, তাঁকে তিনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। যখনই হযরত যাকারিয়া (আঃ) কক্ষে মরিয়ম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখনই তাহার নিকট অভিনব ও অলৌকিক খাদ্য সামগ্রী দেখিতে পাইতেন। তিনি বলিতেন, হে মরিয়াম, এই সব তুমি কোথায় পাইলে? সে বলত, উহা আলাহ্‌র নিকট হইতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন

(সুরা আলে ইমরান–৩৭)

হযরত ইমরান (আঃ) এর পরিবারকে আলাহ্তালা যেভাবে নির্বাচন করেছেন, অনুরূপভাবে হযরত মরিয়ম (আঃ)কে হযরত ইমরান (আঃ) এর পরিবারের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে বিশেষভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্তালা হযরত মরিয়ম (আঃ)কে পবিত্র করেন এবং পৃথিবীর সকল মহিলাদের মধ্যে তাঁকেই নির্বাচিত করেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য কোরআনে বর্ণনা হয়েছে ঃ

স্মরন কর, যখন ফিরিশতাগন বলিয়াছিল, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মরিয়ম (আঃ) তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও ও সেজদা কর এবং যাহারা রুকু করে, তাহাদের সহিত রুকু কর।

(সুরা আল ইমরান ৪২-৪৩)

হযরত মরিয়ম (আঃ) যে সমাজে বাস করতেন, সেখানে তিনি আল্লাহর প্রতি বিশেষভাবে নিবেদিত ও অনুগত একজন অনন্যা মহিলা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন, যিনি তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন। এ ব্যাপারে আলাহ্ কোরআনে আরো দৃষ্টান্ত দিয়েছেনঃ

ইমরান তনয়া মরিয়ম যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রুহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাহার কিতাব সমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের মধ্যে অন্যতম ।

(সুরা তাহ্রীম–১২)

হযরত ঈসা (আঃ) এর পিতা ব্যতীত জন্ম:

হযরত ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক জন্মের মাধ্যমে আল্লাহ্তালা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারন ঘটনাবলীর একটির প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করেছেন। কোরআনে এ ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুরা মরিয়ামে হযরত জিবরাইল (আঃ) যেভাবে হযরত মরিয়াম (আঃ) এর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

বর্ণনা কর, এই কিতাবে উল্লেখিত মরিয়ামের কথা, যখন সে তাঁহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় লইল। অতঃপর উহাদিগ হইতে সে পর্দা করিল। অতঃপর, আমি তাহার নিকট আমার রুহকে পাঠাইলাম। যে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

(সুরা মরিয়াম–১৬-১৭)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর পবিত্র জীবনের কোন এক পর্যায়ে তার জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব দিকের কোন এলাকায় অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে একজন সাধারন মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হন। এই আয়াতে অন্য যে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা হলো হযরত মরিয়ম (আঃ) এর মহান ও পবিত্র চরিত্র ও তাঁর খোদাভীরুতা। হযরত জিবরাইল (আঃ) কে দেখে তিনি সর্বপ্রথম যে বাক্যটি উচ্চারন করেন, কোরআনের ভাষায় তা হলো, “আমি তোমা হইতে দয়াময়ের স্মরন লইতেছি আল্লাহকে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও” (সুরা মরিয়ম–১৮)।

হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) কে তাঁর পরিচিতি দিলেন এবং বলেন যে, তিনি আলাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য একটি সুসংবাদ প্রদানের জন্য আগমন করেছেন। হযরত জিবরাইলের বক্তব্য ছিল :

আমি তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য

(সুরা মরিয়াম - ১৯)

হে মরিয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন্ তাহার নাম মস্হীহ (Messiah) মরিয়ম তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হইবে।

(সুরা আলে ইমরান–৪৫)

এই সুসংবাদ শ্রবনের পর হযরত মরিয়াম (আঃ) প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, তাঁর কিভাবে পুত্রসন্তান হবে, যেখানে তাঁকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই। কোরআনের বর্ণনা, “মরিয়াম বলিল, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যাভিচারিনীও নই? সে বলিল, এরূপই হবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এজন্য সৃষ্টি করিব সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ। ইহা তো একটি স্থিরকৃত ব্যাপার (সুরা মরিয়ম ২০–২২)। সে (মরিয়ম) বলিল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই। আমার সন্তান হইবে কিভাবে? তিনি বললেন এইভাবেই, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, “হও” এবং উহা হইয়া যায়। (সুরা আল ইমরান–৪৭)। কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) কে এক পুত্রের সুসংবাদ দিলেন এবং বল্লেন, আল্লাহ শুধুমাত্র “হও” বল্লেই তা বাস্তবে পরিনত হয়। হযরত মরিয়ামকে (আঃ) কোন পুরুষ কখনও স্পর্শ করে নাই। অন্য কথায় হযরত ঈসা (আঃ) অন্যান্য সাধারন শিশুর মত দুনিয়ায় আবির্ভূত হন নাই। হযরত ঈসা (আঃ) জীবনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মত তার জন্মও একটি মহা অলৌকিক ঘটনা যা তার জীবনে সংঘটিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে তাঁর এই পৃথিবীতে পুনরাবির্ভাবও হবে আল্লাহর কুদরতে আর একটি অলৌকিক বিষয়।

যখন হযরত মরিয়ম এই দূরবর্তী এলাকায় অবস্থান করছিলেন, আল্লাহতালা তাকে শারীরিকভাবে ও বস্তুগতভাবে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করেন। তিনি গর্ভবতী অবস্থায় সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর অভিভাবকত্বের আওতায় ছিলেন এবং তিনি তার সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন। ইতোমধ্যে আলাহ্তালা তাঁকে একটি নিরাপদ ও গোপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, যাতে এই ধরনের অলৌকিক বিষয়ে অজ্ঞ লোক তার বিরক্তি বা ক্ষতির কারন হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

হযরত ঈসা (আঃ) কালেমা বা বাক্য তথা হুকুম

আলাহ্তালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্য কোন সাধারন মানুষের মত নয় বরং তিনি আল্লাহতালার ইচ্ছায় একজন অনন্য অসাধারন ও অলৌকিক ব্যক্তিত্ব। কোরআন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে, তিনি কুমারী মাতার পুত্র যা একটি মহা অলৌকিক ঘটনা বা বিষয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পূর্বে আল্লাহতালা তাঁর মাতাকে, হযরত ঈসা (আঃ) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন। বিশেষভাবে তিনি যে বনি ইসরাইল বংশের লোকদের জন্য একজন ত্রাণকর্তা (Messiah) এবং তাকে আল্লাহতালার মহান বাণী বা কালিমাতুল্লাহ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে:

ঈসা, মসীহ, মরিয়াম তনয়, তো আল্লাহর রাসুল, তার বানী, যাহা তিনি মরিয়ামের নিকট প্রেরন করেছিলেন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রুহ

(সুরা নিসা–১৭১)

ফেরেশতারা যখন বলেন,

হে মরিয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম মসীহ, মরিয়াম তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হইবে।

(সুরা আলে ইমরান–৪৫)

আলাহ্‌তালা হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর নাম রেখেছেন, যেমনটি হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আল্লাহতালা তাঁর নাম রেখেছেন, মসীহ বা ত্রানকর্তা, পয়গম্বর ঈসা ও মরিয়াম তনয়। এটি এমন একটি মর্যাদা যা প্রমান করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহতালা বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন ও তিনি কোন স্বাভাবিক বা সাধারন কোন ব্যক্তি নন। প্রকৃতপক্ষে যে অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁর জীবনে তিনি যে সকল অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছেন, যেভাবে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আলাহ্‌র অনুকম্পায় প্রতিপালন করা হয়েছে, এ সব নির্দেশনাবলী থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, তিনি একজন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব।

হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম:

আমরা সবাই জানি, শিশুর জন্ম তথা প্রসব বিষয়টি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া যেখানে অতি সতর্কতা ও যত্নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কোন অভিজ্ঞ ধাত্রী বা চিকিৎসা সেবা ব্যতীত ব্যাপারটি অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হযরত মরিয়ম (আঃ) তিনি এই মানব জীবনের একটি অতি জটিল ও কষ্টসাধ্য পর্যায় শুধুমাত্র আলাহ্‌র উপর

তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্যতীত পার্থিব কোন প্রকার সাহায্য বা সহযোগিতা গ্রহণ না করেই অতিক্রম করেছেন।

আলাহ্‌তালা কঠোর প্রসব বেদনায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ও নিয়ন্ত্রন করেছেন। এভাবেই তিনি শিশু হযরত ঈসা (আঃ) কে অনায়াসে জন্ম দিয়েছেন যা ছিল তাঁর প্রতি আলাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও করুনা। এ বিষয়ে কোরআনের বর্ণনা ঃ

প্রসব বেদনা তাহাকে এক খেজুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলল, হায়! ইহার পূর্বে আমি যদি মারা যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতাম। ফিরিশতা তাহার নিম্ন প্রার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল দুঃখ করিওনা। তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি, তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে নাড়া দাও। উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করবে। সুতরাং আহার কর, পান কর, চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে যদি কাহাকেও দেখ তখন বলিও, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না।

(সুরা মরিয়াম ২০-২৬)

হযরত ঈসা (আঃ) দোলনা থেকেই কথা বলতেন:

স্মরন কর, সেই নারীকে (হযরত মরিয়ম (আঃ) যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল। অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রুহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য একটি নির্দশন হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছি।

(সুরা অম্বিয়া–৯১)

হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম যা একটি অনন্য সাধারন ঘটনা, এটি তাঁর এবং তাঁর জনগণের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল। প্রকৃতপক্ষে যে প্রক্রিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল একটি মহা অলৌকিক ঘটনা। এটি ছিল ঈমানদারদের জন্য একটি সতর্কবানী ও আলাহর অস্তিত্বের প্রকাশ্য প্রমান। যা তার জনগণ বুঝতে সক্ষম হয় নাই এবং সন্দেহ প্রবন হয়ে উঠে, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল। উহারা বলিল, হে মরিয়ম। তুমি তো এক অদ্ভুত কান্ড করিয়া বসিয়াছ। যা হারুন ভগ্নী। তোমার পিতা, অসৎ ব্যক্তি ছিলনা এবং তোমার মাতাও ছিলনা ব্যভিচারিনী।

(সুরা মরিয়াম ২৭–২৮)

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, দূরবর্তী স্থান থেকে শিশু ঈসা (আঃ) কে নিয়ে হযরত মরিয়ম (আঃ) লোকালয়ে আগমন করলে জনগণ তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয় নাই, বরং তারা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ও কুরুচিকর অপবাদ ছড়াতে থাকে। তারা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর জন্ম থেকেই চিনতো ও তার খোদভীরুতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে জানত। যেমন ইমরান (আঃ) তার পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাই এ ধরনের মহান পবিত্র ও চরিত্রবতী রমনী যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের নিন্দা বা অপবাদ হযরত মরিযম (আঃ) এর জন্য ছিল একটি কঠিন পরীক্ষার বিষয়। আলাহতালা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর জন্ম থেকে তাঁর সকল বিষয়ে সাহায্য করেছেন এবং তার সকল কাজকে মঙ্গলময় করে দিয়েছেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) নিশ্চিত ভাবে জানতেন যে সব ঘটনাবলী ঘটছে তা আল্লাহর

নির্দেশে ও ইচ্ছাই সংঘটিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তার বিরুদ্ধে সকল প্রকার অপ্রচার ও নিন্দার মীমাংসা করে দিবেন।

আলাহ্তালা তাঁকে কথা না বলার ব্রত পালনের নির্দেশের মাধ্যমে বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহতালা যখন হযরত মরিয়ম (আঃ) কে, হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিলো, যে শিশু ঈসা (আঃ) দোলনা থেকে কথা বলবেন যা ছিল একটি মুজিজা। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পূণ্যবানদের একজন।

(সুরা আল ইমরান–৪৬)

আলাহ্তালা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর জন্য বিষয়টি এভাবে সহজ করে দিলেন তা হলো যে, এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য কথাটি বা বিষয়টির সার্বিক ব্যাখ্যা হযরত ঈসা (আঃ) এর পবিত্র মুখের বাণীর মাধ্যমে বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে হযরত মরিয়মের (আঃ) বিরুদ্ধে সকল প্রকার কুৎসা, নিন্দা ও অপবাদ চিরকালের জন্য তার জনগণের মন-মানস থেকে অপসারিত হয়ে গেল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

অত:পর, মরিয়ম সন্তানের প্রতি ইংগিত করিল। উহারা বলিল, যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলব? সে বলিল, ঈসা (আঃ) আমি তো আল্লাহর বান্ধা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন। যেখানেই আমি থাকিনা কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন। যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায়

করিতে। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধুত ও হতভাগ্য, আমার প্রতি শান্তি যে দিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি। যে দিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব।

(সুরা মরিয়ম ২৯-৩৩)

কোন শিশুর পক্ষে দোলনায় এ ধরনের কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট ধরনের অলৌকিক ঘটনা। তদানীন্তন সমাজের জনগন এই শিশুর মুখে এ ধরনের জ্ঞানপূর্ণ বানী শুনে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বুঝতে পারলো যে, তারা আল্লাহ তালার একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী প্রমান করে যে, এই ভাগ্যবান শিশুটি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পয়গম্বর।

হযরত মরিয়ম (আঃ) এর প্রতি এটি ছিল আল্লাহতালার অপার করুনা ও অনুগ্রহ। এই ধরনের অলৌকিক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি তার মরিয়ম (আঃ) এর বিরুদ্ধে আনীত সকল প্রকার অপবাদ ও নিন্দা থেকে নিজ থেকে কোন কথা না বলেও মুক্ত হয়ে গেলেন। এতদসত্বেও কেহ যদি তার সম্পর্কে কু-ধারনা পোষন করে তাহলে আল্লাহতালা তাদের জন্য কঠোর শাস্তি বা কঠিন পরিনতির সংবাদ দিয়েছেন। এটিও কোরআন ঘোষণা করে যে, “তাহারা লানৎগ্রস্থ (অভিশপ্ত) হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য (সুরা নিসা–১৫৬)।

হযরত ঈসা (আঃ) এর মুজিজা সমূহ ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) এর কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম হওয়া, নবজাত শিশু হিসাবে দোলনায় শুয়ে নিজের নবী দাবী করা ছাড়াও তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় বহু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি মুজিজার মাধ্যমেই প্রমানিত হয় যে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত। কারণ শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতা বলেই কোন নবজাত শিশু ঈমানের সাথে এত দৃঢ়তার সাথে এ ধরনের বিজ্ঞোচিত কথা বলতে পারে। আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরন কর। পবিত্র আত্মার দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছি এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে তোমাকে কিতাব, হিকমত ও তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম"

(সুরা মায়িদা-১১০)

কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) এর অন্যান্য মুজিজা বা অলৌকিক কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহাকে আল্লাহ (ঈসাকে) বনি ইসরাইলের জন্য রসুল নির্বাচন করেন। তিনি (রসুল) বলেন:

আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষে হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করি। অতঃপর উহাতে ফুৎকার দিই। ফলে আলাহর হুকুমে ইহা পাখী হইয়া যায়। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্থকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জিন্দা করি। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর আর তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিই বা দিতে পারি। তোমরা যদি মুমিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে"।

(সুরা আল ইমরান-৪৯)

এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও কেহ কেহ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে যাদু হিসাবে আখ্যায়িত করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর বাণী প্রচার ও তিনি যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হনঃ

হযরত ঈসা (আঃ) যখন তার বাণী প্রচার করেন এই সময়ে কিছু ইহুদী ধর্মীয় নেতা তাদের ধর্মের একজন শত্রু হিসাবে বিবেচনা করে, যদিও আল্লাহর নবীকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তারা ধর্ম পরিত্যাগকারী বা কাফিরে পরিগণিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ) প্রকৃতপক্ষে জনগণকে মূল ধর্মের দিকে আহ্বান করেন এবং যে সমস্ত ধর্মীয় বিধান তারা (তদানীন্তন ইহুদী নেতৃবৃন্দ) নিজেদের স্বার্থে তৈরী করেছিল তা বাতিল ঘোষণা করেন। কারণ হযরত মুসা (আঃ) এর পর ইহুদী ধর্মীয় নেতারা মূল তৌরাতের অনেক করনীয় বিষয় বর্জনীয় এবং বর্জনীয় বিষয় করনীয় হিসাবে চালু করেছিল।

এভাবে এই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের খেয়াল খুশি ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইহুদী ধর্মকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন সাধন করে ও এই ধর্মে অনেক অনাচার ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর এই ধর্মকে সকল প্রকার অপবিত্রতা, অনাচার, কুসংস্কার, বেদাত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিত্যনতুন আচার আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন, কারন এটাই আলাহর নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত ঈসা (আঃ) জনগণকে তার উপর নাজিলকৃত কিতাব ইনজিলের পথে আহ্বান করেন, যা মূল তৌরাত এর সত্যায়ন ও সমর্থনকারী পুস্তক হিসাবে কোরআনে ঘোষনা করা হয়েছে:

আমি আসিয়াছি, আমার সম্মুখে, তৌরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক রূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আমাকেই অনুসরন কর।

(সুরা আল ইমরান–৫০)

আল্লাহ ইনজিল কিতাব সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে বলেন:

“এর মধ্যে রয়েছে সত্য পথের নির্দেশাবলী বিশ্বাসীদের জন্য। আর এর মধ্যে রয়েছে ভাল ও পার্থক্যকারী জ্ঞান এবং এটি তাওরাত কিতাবে সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তৌরাত কিতাবের সমর্থক রূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহারা পূর্বে অবতীর্ণ তৌরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ তাহাকে ইনজীল দিয়েছিলাম উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো

(সুরা মায়িদা–৪৬)

হযরত ঈসা (আঃ) কাছে নাযিলকৃত ধর্ম, কিতাব ও শিক্ষা সম্পর্কে বনি ইসরাইল গোত্রের অনেকে সন্দেহ পোষন করতে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ) এর আলাহ্র প্রতি আনুগত্য, পার্থিব জীবনের বিলাস ও বাহুল্য পরিত্যাগ, অকপট বা সরল জীবন যাপন, সততা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে মিথ্যা ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক কুসংস্কার ত্যাগ করতে বলেন। আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) এর শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ

ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, তখন সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কর্তৃক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরন কর।

আল্লাহ তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল পথ। অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল। সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মমন্তুদ দিবসের শাস্তির।

(সুরা যুখরুফ ৬৩-৬৫)

হযরত ঈসা (আঃ) এর অকপটতা ও জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা জনগণকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিছু সংখ্যক ইহুদী দাবী করে যে তারা হযরত ঈসা (আঃ) হত্যা করে ছিল:

সাধারনভাবে বলা হয়ে থাকে যে, রোমানরা হযরত ঈসাকে (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। এই দাবী অনুযায়ী রোমক শাসকগণ কিছু সংখ্যক ইহুদী ধর্মীয় নেতা হযরত ঈসাকে (আঃ) গ্রেপ্তার করে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্ট ধর্মালম্বীরা এটাই বিশ্বাস করে এবং ধারনা করে যে, তিনি এভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। পরবর্তীতে জীবিত হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করেছেন। যাহোক, পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে, এই ঘটনা সত্য নয় বরং হযরত ঈসাকে (আঃ) হত্যাও করা হয় নাই বা তিনি মৃত্যুবরনও করেন নাই।

তারা দাবী করে যে, আমরা আলাহ্র রসুল মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই। কিন্তু তাহাদের এই রূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরন ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই"

(সুরা নিসা– ১৫৭)

কোরআনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে: বরং আল্লাহ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় (সুরা নিসা–১৫৮)।

পবিত্র কোরআনে অতি স্পষ্টভাবে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদিগণ কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে রোমান শাসক গোষ্ঠি কর্তৃক হযরত ঈসাকে (আঃ) হত্যা প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। এই বিষয়টি কোরানের এই আয়াত "কিন্তু তাহাদের এইরুপ বিভ্রম হইয়াছিল" বাক্যের মধ্যে ঘটনাটির মূল সত্য নিহিত আছে। হযরত ঈসাকে (আঃ) হত্যা করা হয় নাই, বরং তাঁকে আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ বলেন যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে মর্মে যারা দাবী করে, প্রকৃত সত্যের সাথে তাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

আল্লাহতালা বেঈমানদের ষড়যন্ত্র বিফল ও বানচাল করে দিয়েছেন:

হযরত ঈসা কে (আঃ) হত্যা করার প্রচেষ্টা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী–রসুলকে (আঃ) কাফির বা ধর্মদ্রোহী লোকেরা হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতালা বর্ণনা করেছেন যে, যখনই কোন পয়গম্বর কোন জনগোষ্ঠির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, তিনি তাদেরকে সত্যিকার ধর্ম পালনের মাধ্যমে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তখন অবিশ্বাসীরা অবধারিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি তাদেরকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাও করেছে।

নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি। মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমান দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে যখনই কোন রাসুল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনয়ন করিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছো আর কতককে অস্বীকার করিয়াছো এবং কতককে হত্যা করিয়াছো।

(সুরা বাকারা–৮৭)

হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) যারা আগুনে নিক্ষেপ করেছে, হযরত মুসার (আঃ) বিরুদ্ধে সেনাবহিনী লেলিয়ে দিয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে রাতের অন্ধকারে গোপনে হত্যার করার পরিকল্পনা করেছে এবং হযরত ইউসুফ কে (আঃ) কুয়ার নিচে ফেলে দিয়েছে। এর একমাত্র কারন হলো এরা সব মহান আলাহ্র পয়গম্বর যারা বলেছেন, "আল্লাহ আমাদের প্রভু। যদিও তারা একই বানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির কাছে"।

এই সকল জনগোষ্ঠি আল্লাহ ও তাঁর মহান পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। আল্লাহ্তালা কর্তৃক নৈতিক চরিত্র গঠনের বিরোধিতা করেছে এবং পারলৌকিক জীবনে তাদেরকে যে আল্লাহতালার কাছে তাদের পার্থিব কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তা তারা সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করেছে এবং গুরুত্বহীন বিবেচনা করেছে। পয়গম্বরদের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। একথা শোনার সাথে সাথে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। আল্লাহর পয়গম্বরগন, যে নিষ্কলংক মাসুম তথা নিষ্পাপ হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত, তাই তারা মানব জাতিকে ন্যায়নিষ্ঠ ও বিনীত ও সুশীল জীবন যাপন করার তাগিদ দিয়েছেন তা এই সব বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী গ্রহণ করতে রাজী হয় নাই। বরং তারা এই সব নবী– রসুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার শত্রুতা,

প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তাদেরকে ঘোরতর বিপদে ফেলার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে। তাদের নিকট রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখনই কোন রাসুল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয় তখনই তাহারা কতকে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। (সুরা মায়েদা–৭০)।

একই ধরনের পরিকল্পনা মুশরিকগণ আমাদের প্রিয় নবীকে (সাঃ) বিরুদ্ধে করেছিল। তারা নবী (সাঃ) কে মক্কা থেকে বহিষ্কার এবং এমনকি হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিল। আল্লাহতালা তাঁকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই মুশরিকগণ বুঝতে পারে যে, আল্লাহতালা অনেক উন্নত পরিকল্পনাকারী। কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য হত্যা করিবার জন্য অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ ও কৌশল করেন আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী ।(সুরা আনফাল–৩০)।

আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি, অবিশ্বাসীরা হযরত ঈসা কে (আঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তারা এ ব্যাপারে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা করে তাকে গ্রেপ্তার বা বন্দী করার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক তথ্য ও ইসলামী উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইহুদিদের মধ্যে কিছু কিছু মুশরিক হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে রোমান শাসকদের উত্তেজিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গুজব ও ভিত্তিহীন প্রচারনা শুরু কওে, যাতে রোমানরা হযরত ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে তথাকথিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ঈসা (আঃ) যখন তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, আল্লাহর পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী, হাওয়ারীগন বলল যে, আমরাই আলাহ্র পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আলাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি। আমরা

আত্মসমর্পনকারী। তুমি ইহার সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি যাহা অবতীর্ণ করেছো তাহাতে আমরা ঈমান আনয়ন করিয়াছি এবং আমরা রাসুলের অনুসরন করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর। আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল। আল্লাহও কৌশল করিয়াছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

(সুরা আল ইমরান ৫২-৫৪)

আল্লাহতালা ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা অপ্রত্যাশিতভাবে বিফল করে দেন। তাদেরকে দেখানো হলো, হত্যা করানো হলো অথচ তা সঠিক ছিলনা অর্থাৎ তারা দুই ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হলো। অন্যদিকে আমাদের মহান প্রভু তাঁর নির্বাচিত বান্দাকে অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত ঈসা (আঃ) মৃত নয় বরং তিনি আলাহতালার পবিত্র সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত তারা করেছিল আলাহতালা তা বানচাল করে দিয়েছেন, তা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। এটি এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে প্রমানিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এখন জীবিত রয়েছেন। যদি হযরত ঈসা (আঃ) প্রকৃতপক্ষেই মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। তাহলে তাকে হত্যার মাধ্যমে খোদাদ্রোহীদের বিজয় সূচিত হয়েছে মর্মে বিবেচিত হতো যা প্রকৃত সত্যের বিপরীত।

পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

আল্লাহ কখনও মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।

(সুরা নিসা–১৪১)

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি খোদাদ্রোহীদেরকে, হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধে কোন সুযোগ দেবেন না। তাছাড়া পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের কখনও সফলতা দান করবেন না। বরং তাদের অসফলতা বা ব্যর্থতা আল্লাহতালার ঐশী পরিকল্পনার একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ বা শর্ত। এ ব্যাপারটি কোরআনের কিছু আয়াত নিম্নে উদ্বৃত করা হলো ঃ

- তারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতালা উহ্যাতে চক্রান্ত রহিত বা ব্যর্থ করে দিয়াছেন। যদিও উহ্যাদের চক্রান্ত এমন ছিল যাহ্যাতে পর্বতও টলিয়া যাইত।

(সুরা ইব্রাহীম–৪৬)

- ইহ্যাই তোমাদের জন্য, আলাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

(সুরা আনফল–১৮)

- উহ্যারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিনামে কাফিরবাই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।

(সুরা তুর–৪২)

- আলাহ্ রক্ষা করেন মুমিনদিগকে। তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

(সুরা হুজ্ব–৩৮)

- উহ্যারা ভীষন ষড়যন্ত্র করে এবং আমিও ভীষন কৌশল করি। অতএব, কাফিরগণকে অবকাশ দাও। উহ্যাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য

(সুরা তারিক– ১৫–১৭)

○ উহাদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল। আল্লাহ উহাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন। ফলে ইমরাতের ছাদ উহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদের প্রতি শাস্তি আসিল, এমন দিক হইতে যাহা ছিল তাদের ধারনার অতীত।

(সুরা নাহল–২৬)

পবিত্র কোরআনে পয়গম্বরদের মৃত্যুর বর্ণনা :

পবিত্র কোরআনে পয়গম্বরদের মৃত্যুর ঘটনাবলী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ও হযরত ঈসা (আঃ) এর উর্ধারোহনের বর্ণনা পরীক্ষা করে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। এ পরিচ্ছেদে আমরা হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সব আরবী শব্দ ব্যবহার তথা প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি এবং অন্যদিকে অন্যান্য পয়গম্বরদের মৃত্যুর ঘটনাবলী কোরআনের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। তা অনুসন্ধান পূর্বক বিষয়টি আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আমরা বিষয়টি পরবর্তীতে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। পয়গম্বরদের মৃত্যুর বিষয়টি বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে "কাতালাহু" হত্যা করা, "মাতা" মরা, বা মারা যাওয়া, "হালকা ধ্বংস হওয়া শেষ হয়ে যাওয়া। নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ও "সালাবাহু"- ক্রুশবিদ্ধ করা। কোরানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়া মা কাতালাহু" তাঁকে (হযরত ঈসা (আঃ) হত্যা করা হয় নাই। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করাও হয় নাই। অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আঃ) কোনক্রমেই হত্যা করা হয় নাই। এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে বিধর্মীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এমন একজনকে হাজির (শুলাবিদ্ধ বা ক্রুশবিদ্ধ) করা হয়েছিল যার চেহারা

ঈসা (আঃ) এর মত তাদের কাছে মনে হয়েছিল এবং হযরত ঈসা কে (আঃ)। আল্লাহর সান্নিধ্যে উদ্ধারোহন করানো হয়েছিল।

সুরা আল ইমরানের মাধ্যমে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ হযরত ঈসাকে (আঃ) উর্ধারোহনের মাধ্যমে নিজের সান্নিধ্যে রেখেছেন।

স্মরন কর আল্লাহ বলিলেন, হে ঈসা; আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য

(সুরা আলে ইমরান–৫৫)

কোরআনে মৃত্যুর বিষয়টি বোঝানোর জন্য নিম্নবর্ণিত শব্দগুচ্ছ এভাবে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

১। তাওফ্‌ফা– মৃত্যুর কারণ ঘটানো, ঘুমিয়ে পড়া, চির নিদ্রায় শায়িত হওয়া অথবা ফিরিয়ে নেওয়া বা যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন করা।

আলোচ্য আয়াতে তাওফ্‌ফা শব্দটি শুধুমাত্র মৃত্যু নয় বরং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ বহন করে বলে প্রতীয়মান হয়। এই শব্দটির সমার্থক আরবী শব্দগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত অর্থে মৃত্যু বলতে যা বোঝায় হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে তাঁর এ রকম মৃত্যু হয় নাই।

আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুরা মায়িদায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই," তাহা এই তোমরা," আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর

ইবাদত কর এবং যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া (তাওয়াফ্‌ফা) লইলে তখন তুমি তো ছিলে তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী (সুরা মায়িদা–১১৭)।

সুরা আলে ইমরানে বর্ণিত আছে ঃ স্মরন কর আল্লাহ বলিলেন, হে ঈসা, আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া (সুতা ও ফাঝো) এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি (সুরা আল ইমরান–৫৫)।

আরবী ভাষায় এই তাওয়াফ্‌ফা শব্দের অর্থ কোন অনুবাদক কর্তৃক মৃত্যু ঘটান মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাওফ্‌ফা শব্দটির মূল শব্দটি হলো ওয়াফা অর্থাৎ পূর্ণ করা। আরবী ব্যাখ্যায় শব্দটির তরজমা বা অনুবাদ মৃত্যুর সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয় নাই। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবীর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শব্দটি “নিয়ে যাওয়া” অর্থে ব্যবহার করেছেন। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কাউকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সব সময় মৃত্যু নয়। কোরানের একটি আয়াতে তাওফ্‌ফা শব্দটি নিয়ে যাওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে যেমন ঘুমের মধ্যে মানবাত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

“তিনিই তোমাদিগকে রাত্রিকালে ঘুমের মধ্যে নিজের কাছে নিয়ে যান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয় (সুরা আনআম–৬০)। এই আয়াতে তাওয়াফ্‌ফা শব্দটির অর্থ নিয়ে যাওয়া বা ফেরত পাঠানো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুরা আল ইমরানের ৫৫নং আয়াতে এই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটা

অত্যন্ত পরিষ্কার যে ঘুমের মধ্যে লোকের মৃত্যু হয় না। অতএব এই শব্দটির অর্থ ফেরত নিয়ে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন করা অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটি নিম্নের আয়াতে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে যান (ইয়া তাফ্ফার) জীব সমূহের মৃত্যুর (মাওতিহা) সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই, তাহাদের প্রানও নিদ্রায় সময়। (লামতামুত) অতঃপর তিনি যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

(সুরা যুমার ৪২)

কোরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ ঘুমের মধ্যে লোকের আত্মা তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যান। এবং যাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয় নাই তাদের আত্মাকে ফিরিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঘুমের মধ্যে লোকের মৃত্যু ঘটেনা, যে অর্থে আমরা মৃত্যু বুঝে থাকি। অর্থাৎ সামান্য কিছু সময়ের জন্য আত্মা শরীর ছেড়ে ভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আত্মা শরীরের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসে।

অন্য একটি উদাহরনে থেকে জানা যায় যে, ঘুম এক ধরনের মৃত্যু। কিন্তু এটি জৈবিক মৃত্যু নয়। রসুল (সঃ) ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এই দুয়া পাঠ করতেন" সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ঘুম (মৃত্যু) থেকে জীবিত করেন। (সহী বোখারী আল হামদু লি আল্লাহু ইলাহা আহাইয়া বা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাহী আল নুসহু)

রসুল(সঃ) নিশ্চয় এই জ্ঞান গর্ভ শব্দ আক্ষরিক বা জৈবিক মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করেন নাই। বরং ঘুমের মধ্যে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয় এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত, এই হাদীস ও অন্যান্য প্রমানাদি উল্লেখপূর্বক তাওয়াফ্ফা শব্দটির অর্থ মৃত্যু নয় বরং ঘুম হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এই শব্দটির ব্যবহার পর্যালোচনা করে তার মতামত দিয়েছেন যে, হাদীসটি ইবনে আবি হাতীম যেটি বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা হাসান থেকে জেনে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিব বাক্যটির অর্থ হলো, আমি তোমাকে ঘুমের মাধ্যমে মৃত্যু দান করব। অন্য কথায় আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিব। অর্থাৎ আল্লাহতালা হযরত ঈসাকে (আঃ) ঘুমন্ত অবস্থায় বেহেশতে আরোহন করান যা তর্কাতীত ভাবে সত্য। আল্লাহতালা হযরত ঈসা (আঃ) কে ঘুমের মৃত্যু দান করেন অতঃপর তাঁকে উর্ধে আরোহন করান। ইহুদীরা যখন তাঁকে নির্যাতন করছিল তখন আলাহ্তালা সম্ভবত: এই পদ্ধতিতে তাঁকে উদ্ধার করেন (আল্লাহ ভাল জানেন)।

ইমাম মুহাম্মদ জাহিদ আল কাওহারী, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ তাওয়াফ্ফা শব্দটির অর্থ পরীক্ষা করে মতামত প্রকাশ করেন যে, এই শব্দটির অর্থ মৃত্যু নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি কোরানের অন্য একটি আয়াতে ‘মওত’ শব্দ এর ব্যবহার উল্লেখ করেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি মৃত্যুমুখে পতিত হতেন (যা সত্য নয়) তাহলে এই বাক্যে ‘মওত’ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। যেমন “আলাহ্ প্রান হরন করেন বা আলাহ্ মৃত্যু দান করেন। (সুরা যুমার–৪২)। এখানে ‘মওত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদি সাধারন জৈবিক মৃত্যু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হতো, তাহলে তা সরলভাবে বলা হতো। যেহেতু আল্লাহতালা, উল্লেখ করেছেন, ইহুদীরা তাকে হত্যা করে নাই বা হত্যা

করতে সক্ষম হয় নাই এবং তাকে উর্ধে আরোহন করানো হয়েছে, এটাই মূল বক্তব্য। তাই এটি সরলার্থে মৃত্যু মনে করার কোন সুযোগ নাই।

কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারক আবু মনসুর মুহাম্মদ আল–মাতুরীদি বর্ণনা করেন, এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর জৈবিক মৃত্যুর বিষয়টি উল্লেখিত হয় নাই। আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়া থেকে তার শরীর উর্ধাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত তাফসীরকারক তাবারী উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতে "দুনিয়া থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে" মর্মে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই আয়াতটির সবচেয়ে নিরাপদ সুন্দর বা সঠিক ব্যাখ্যা এটাই– "কারো নিয়ন্ত্রনে" বা অভিভাবকত্বে বা মালিকানায় নিয়ে নেওয়া" সেক্ষেত্রে আয়তটির সার্বিক অর্থ দাঁড়ায়– আমি তোমাকে এই দুনিয়া থেকে বেহেশতে নিয়ে যাব। আয়াতটির অন্যান্য বিষয় ঈমানদারদের বিজয় ও খোদাদ্রোহীদের পরাজয় যা আখেরী জমানায় সংঘটিত হবে।

হামদী ইয়াজীর তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটির যথার্থ হলো, হযরত ঈসা (আঃ) এর আত্মা "যিনি আলাহ্র কালাম" যাকে পুনরায় "পবিত্র আত্মার" মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়েছে, তা এখন পর্যন্ত নিয়ে নেয়া হয় নাই। তাঁর আত্মা মৃত্যুর পর্যায়ে পৌছায় নাই। সেই 'কালিমা' আল্লাহ্র কাছে ফেরত যায় নাই বরং এই পৃথিবীতে তার কাজ বাকী রয়ে গেছে।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে, হযরত ইসাকে (আঃ) এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থায় উপনীত করে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত ঈসা (আঃ) যারা যান নাই বরং তাঁকে এই পার্থিব মাত্রা

(Dimension) থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয় (প্রকৃত সত্য আলাহ্ই অবগত আছেন)।

২। কাতালা (মেরে ফেলা) ঃ এই শব্দটি সাধারনভাবে হত্যা করা বা মেরে ফেলা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনে মৃত্যু বা হত্যা বোঝাতে আরবী "কাতালা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সুরা গাফির বা (মুমিনুন ২৬) এ বলা হয়েছে ঃ ফারাও (ফিরাউন) বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তারপর প্রভুকে ডাকুক আহ্বান করুক। আমি আশংকা প্রকাশ করি যে, তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দিবে এবং এই রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

আমি মুসাকে হত্যা করিব। এই বাক্যে "আকতাল্যু" ব্যবহার করা হয়েছে যা ক্রিয়া "কাতালা" শব্দ থেকে উদ্ভূত। অন্য একটি আয়াতে এই শব্দটি এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ তারা বহু পয়গম্বরকে হত্যা করিয়াছে (ইয়াকতুলুনা) যদিও এটি করার জন্য তাদের কোন অধিকার ছিল না। (সুরা বাকারা–৬১)।

এই আয়াতের মূলে আরবী "ইয়াকতুলুনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা কাতাল শব্দ থেকে সৃষ্ট। এর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট তা হলো, হত্যা করা। নিম্নলিখিত আয়াত সমূহে "কাতালা" শব্দের ব্যবহার বা প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে নবীদের মৃত্যু সম্পর্কে কোরানে ব্যবহৃত শব্দ "কাতালাকে" সঠিক প্রয়োগ বা অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা (ওয়া কাতলাহুম) করার বিষয় আমি লিখিয়া রাখিব

(সুরা আলে ইমরান– ১৮১)

তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অপকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা (তাকতুলুনা) করিয়াছ

(সুরা বাকারা–৮৭)

তোমরা যদি মুমিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীকে হত্যা তাকতুলুনা করিয়াছিলে?

(সুরা বাকারা–৯১)

যাহারা আলাহ্‌র নির্দশন বা আয়াতকে অস্বীকার করে অন্যায়রূপে নবীদের হত্যা করে (ইয়াকতুলুনা) যারা মানুষের মধ্যে ন্যায় পরায়নতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে।

(সুরা আলে ইমরান–২১)

যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা (লা-কাতালতুমুহুম) করিয়াছিল।

(সুরা আলে ইমরান–১৮৩)

সে বলিল, আমি তোমাকে হত্যা (লা আক্ তুলুন্না কা) করব।

(সুরা মায়েদা ২৭)।

আমাকে হত্যা করিবার জন্য (লিআক তুলিক) তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা (লা আক্ তুলুন্না কা) করার জন্য আমি যাও তুলিব না।

(সুরা মায়িদা–২৮)

ফিরাউনের স্ত্রী বলিল, এই শিশু আমার ও তোমার জন্য নয়ন প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিওনা (লাতাকতুলুহু)।

(সুরা সাস–৯)

হে মুসা, পরিষদবর্গ, তোমাকে হত্যা করবার (লি ইয়াকতুলকা) পরামর্শ করিতেছে।

(সুরা সাস–২০)

ইব্রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, ইহাকে হত্যা (উকতুলুহু) কর

(সুরা আন কাবুত– ২৪)।

৩। **হালাকা–** ধ্বংস করা, নিশ্চিহ্ন করা। কোরআনে ক্রিয়াপদ “হালাকা” শব্দটি “ধ্বংস করা” বা নিশ্চিহ্ন করা অর্থে বোঝায়। বিভিন্ন আয়াতে শব্দটি ধ্বংস করা, নিশ্চিহ্ন করা, হত্যা করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুরা গাকিব (মুমিনুল) একটি আয়াতে যার উদাহরণ পাওয়া যায়। যখন ইউসুফ মৃত্যুমুখে (হালাকা) পতিত হয় (হালাকা), তখন তুমি বলিলে, আল্লাহ তার পরে আর কখনও কাউকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন না (সুরা গাফির–৩৪)। এই আয়াতে যখন তিনি মারা যান, “ইয়াহ হালাকা” অর্থ মৃত্যু হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। **মা’তা** মৃত্যু ঃ কোরআনে পয়গম্বরদের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে মা’তা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। মা’তা অর্থাৎ সে মারা গিয়াছে এবং মূল এ শব্দটি থেকে অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ) এর মৃত্যু প্রসঙ্গে সুরা সাবায় উল্লেখ করা হয়েছে, যখন আমরা সোলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম (মওত) তখন জিনদিগকে তাহার মৃত্যুর (মাওতিহি) বিষয় জানাইল, কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল (সুরা সাবা– ১৪)।

হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

তাহার প্রতি শান্তি যে দিন সে জন্ম লাভ করে, যেদিন তার মৃত্যু (ইয়ামাতু) হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে।

(সুরা মরিয়াম– ১৫)

যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন, বাক্যটি প্রকাশ করার জন্য "ইয়ামুতু" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে একই শব্দ হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে:

ইয়াকুবের যখন মৃত্যু (মউত) আসিয়াছিল তখন কি তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?

(সুরা বাকারা–১৩৩)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ একজন রাসুল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রাসুল গত হইয়াছে।

যদি সে মারা যায় (মা'তা) অথবা নিহত (কুতিলা) হয়, তাহলে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ?

(সুরা আলে ইমরান– ১৪৪)

তিনি (মরিয়াম) বলিলেন, হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম

(সুরা মরিয়ম– ২৩)

আমরা তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন (খুলদ) দান করি নাই। সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে (সুরা আম্বিয়া– ৩৪) এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটান (ইউমিতুন্নী) অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন (সুরা আস শোয়ারা –৮১)।

৫। খালিদ ঃ চিরজীব

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মৃত্যুবরন করা, বা হত্যা করা শব্দটি সরাসরি ব্যবহার না করে অন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেটি হলো "খালিদ" অর্থাৎ অমর বা চিরঞ্জীব। "খালিদ" শব্দের অর্থ হিসাবে চিরস্থায়ী বিবেচনা করা যায়। উদাহরনস্বরূপ কোরআনের সুরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

আমি তাহাদিগকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না। তাহারা চিরঞ্জীব (খালিদিনা) ছিল না।

(সুরা আম্বিয়া– ৮)

৬ ।সালাবা- ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা, পয়গম্বরদের মৃত্যুর বিষয়টি বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরানে "সালাবা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটির অর্থ ফাঁসী দেওয়া, ক্রুশবিদ্ধ করা এবং হত্যা করা। এই ক্রিয়াদটি নিম্নবর্ণিত আয়াত সমূহে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই বা ক্রশবিদ্ধ (ওয়া–মা–সালাবুহু) করে নাই। (সুরা নিসা– ১৫৭)।

প্রভুকে মদ্যপান করাইবে এবং অপরজন শুলবিদ্ধ (ইয়ুসলাবু) হইবে। (সুরা ইউসুফ ৪১) তাহাদিগকে হত্যা অথবা ক্রুশবিদ্ধ (ইউসাল্লাবু) করা হইবে (সুরা মায়িদা– ৩৩)। আমি (ফিরাউন) তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করবই, অতঃপর তোমাদের সকলকে শুলবিদ্ধ (লা–ইউসাল্লি বান্নাকুম) করিব। (সুরা আরাফ– ১২৪)।

আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শুলবিদ্ধ (ইউসাল্লাবান্নাকুম) ফিরাউন বলিল, আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং পা বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকেই শুলবিদ্ধ (ইউসাল্লি বান্নাকুম) করব। (সুরা শুআরা–৪৯)।

এই বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, পয়গম্বগনের মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাতালা কোরআনে ঘোষণা করেছেন, হযরত ঈসাকে (আঃ) হত্যা করা হয় নাই বরং তাঁর মত সাদৃশ্যপূর্ন কোন ব্যক্তিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল বা দেখানো হয়েছিল এবং হযরত ঈসাকে (আঃ) বা তার আত্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। “তাওয়াফ্‌ফা” শব্দের অর্থ আত্মা নিয়ে যাওয়া, হযরত ঈসা (আঃ) ক্ষেত্রে এ বিষয়টি এই ভাষায়ই প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যান্য পয়গম্বরের “কাতালাহু” এবং মা’তা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই আলোচনায় আবারও প্রমানিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর ঘটনাটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়।

আল্লাহতালা হযরত ঈসা (আঃ) কে শরীর ও আত্মাসহ তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যান:

হযরত ঈসাকে (আঃ) যে মারাও যাননি বা তাকে হত্যাও করা হয় নাই এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত প্রমান হলো, আল্লাহতালা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, ঈসাকে (আঃ) তিনি তার উপস্থিতিতে তথা সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন।

আমি, তোমাকে, আমার নিকট তুলিয়া লইতেছি (রাফিউকা) এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি আর তোমার অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি।

(সুরা আল ইমরান– ৫৫)

বরং আল্লাহতালা তাহাকে তাহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন (সুরা নিসা– ১৫৮)।

আল্লাহতালা হযরত ঈসাকে (আঃ) উদ্ধার ও নিরাপত্তা দান করে তাঁকে ঈসা (আঃ) তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে (রাফিউকা ও রাফাহু) এসব আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলি আরবী 'রাফা' শব্দ থেকে উদ্ভুত যার অর্থ হলো তুলে নেওয়া।

এই সকল আয়াতের মর্মানুযায়ী ইসলামী চিন্তাবিদগণ একমত হয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই বরং তাঁকে আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ শরীর ও আত্মাসহ উর্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইসলামী চিন্তাবিদ আবু মুসা আল আযহারী সুরা আল ইমরানের ৫৫ নং আয়াত ও সুরা নিসার ১৫৮ নম্বর আয়াতের বরাতে লিখেন যে, ঈমানদারদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐক্যমত্য (ইজমা-এ উম্মত) রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শরীর ও আত্মাসহ নিরাপদে জীবিত অবস্থায় বেহেশতে অবস্থান করছেন।

হাসান বসরী কান্তে (Cantay) 'রাফিউকা' "শব্দের অর্থ নিজের (আল্লাহর) কাছে তুলিয়া নেয়া"। অর্থাৎ আল্লাতালা, হযরত ঈসাকে (আঃ) তার নিজের কাছে শরীর ও আত্মাসহ তুলিয়া নিয়াছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া মত প্রকাশ করেছেন, তার সান্নিধ্যে তুলিয়া নিয়াছেন - এই আয়াতের মর্মার্থ হলো আল্লাহতালা হযরত ঈসাকে (আঃ) শরীর ও আত্মাসহ তাঁর নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন। শাহিদ আল কাওসারী উল্লেখ করেছেন, উর্ধ্বে আরোহন বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, এ ব্যাপারে কোন কোন মতদ্বৈততার অবকাশ নাই। তিনি সুরা আল ইমরান এর ৫৫নং আয়াত ও সুরা নিসার ১৫৭-১৫৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে উদ্বৃত করে বলেছেন যে, এটা সন্দেহাতীত। আরো বলেন তিনি নাস (Naas) শব্দের অর্থ হলো নিশ্চিত বা সন্দেহাতীত যা কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। আলোচ্য আয়াতগুলিতে "রাফার" অর্থ হলো নীচে থেকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা বা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থাপন করা বা পরিবহন করা। এই আয়াতের কোনরকম রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ বা অবকাশ নাই। তাই আলোচ্য আয়াতের অন্য কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা যেমন সম্মান বৃদ্ধি করন বা অবস্থানের মর্যাদা বৃদ্ধি করার কোন প্রমান নাই। পবিত্র কোরআনের বর্ণিত আয়াত সমূহ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসাকে (আঃ) জীবিত অবস্থায় তাঁর শরীরসহ আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলিয়া নেয়া হয়। এটি

আল্লাহতালার মহা কুদরত যা ঈমানদারদের জন্য অত্যন্ত আবেগ ও উৎসাহের বিষয়। যারা দাবী করে থাকেন, তাঁর এই উর্ধ্বে আরোহনের বিষয়টি আত্মিক বা রুহানী। যা প্রকৃত ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় মর্মে প্রতীয়মান এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখনী তা সমর্থন করেনা। এই ঘটনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমান হলো আরবী "বাল" শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে। এই শব্দটি সুরা নিসার ১৫৮নং আয়াতে উল্লেখ আছে যার আক্ষরিক অনুবাদ হলো "ইহা নয় বরং উহা" আরবী ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। কারণ আরবী ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী এই শব্দটি যে বাক্যের পরে ব্যবহৃত হয় তা পূর্ববর্তী বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে কোরআনের বর্ণনা এরকম তারা তাকে হত্যা করে নাই (সুরা নিসা– ১৫৭)। "বাল, বরং পক্ষান্তরে বা অপর পক্ষে আল্লাহ তাঁকে তার নিজের কাছে তুলিয়া নিয়েছেন (সুরা নিসা– ১৫৮)"। এতে তার মৃত্যুর বিপরীতে জীবিত থাকার প্রমানই বহন করে। আল্লাহতালা অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করার জন্য হযরত ঈসাকে (আঃ) তাঁর নিকট জীবিত অবস্থায় তুলিয়া নিয়াছেন। উল্লেখিত সকল প্রমান নির্দেশ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) অদ্যাবধি জীবিত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে পুনরায় আগমন করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহ অবগত আছেন।

আল্লাহতালা হযরত ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাসীদের মধ্য হতে পবিত্র করেন:

পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাসীদের থেকে পবিত্রকরনের জন্য উপরে তুলে নেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার (আল্লাহর) নিকট তুলিয়া লইতেছি (ওয়া-রা-ফিউকো) এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি (মুতাহ্ হিরুকা)। আর তোমার অনুসারীগণকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফিরগণের উপর প্রাধান্য দিতেছি। (সুরা আল ইমরান– ৫৫)।

'মুতাহহিরিকা', শব্দের মূল হলো তাহ্–আরা অর্থ পবিত্রকরন। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই শব্দের ব্যবহার হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবিত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়ার একটি প্রমান হিসাবে বিবেচনা করেন। এই বুদ্ধিজীবীরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমি, তোমাকে আমার সান্নিধ্যে তুলিয়া লইতেছি। তোমাকে কাফিরদের বা পাপীদের এই পরিবেশ থেকে পবিত্র করিতেছি। আল্লাহতালা হযরত ঈসাকে (আঃ) অবিশ্বাসী, কাফির ও পাপীদের নিকট থেকে পবিত্রকরনের মাধ্যমে নিজের কাছে তুলিয়া নিয়াছেন। অর্থাৎ অবিশ্বাসী ও খোদাদোহীরা হযরত ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার যে হীন ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহতালা তা বানচাল বা বিফল করে দেন এবং অবিশ্বাসীরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। তাই তিনি জীবিত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থান করার বিষয়টি নিশ্চিত হিসাবে গণ্য করা হয়।

তাছাড়া এই আয়াতে আরো অনুধাবন করা যায় যে, অবিশ্বাসী ও খোদাদ্রোহীদের পরিবেশ থেকে তাঁকে শারীরিকভাবে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তাই হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন এবং তার আত্মা উর্ধ জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মর্মে যে ধারনা বা মতবাদ চালু করা হয়েছে তা অবশ্য অসত্য ও ভিত্তিহীন (আল্লাহ ভাল জানেন)। একটি আত্মার শুধু উর্ধারোহন এর অর্থ এও হতে পারে যে, তাকে পবিত্র করা হয় নাই। সম্পূর্ণ বা সার্বিক পবিত্র করন দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধকরনের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর উচ্চ নৈতিক মান সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, "আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যে দিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব (সুরা মরিয়ম– ৩৩)।

হযরত ঈসা (আঃ) এর আত্মা অবশ্যই নিষ্কুষ ও নিষ্পাপ তথা মাসুম। তবে তার পরিবেশ নিষ্পলক ছিল না। তাছাড়া যে ধরনের খোদাদ্রোহী, অবিশ্বাসী ও পাপী লোক দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন তা ছিল অপবিত্র বা পাপ-পংকিল।

অবিশ্বাসী বা কাফিরগন যে অপবিত্র সেটি কোরআনের সুরা তাওবায় বলা হয়েছে মুশরিকরা তো অপবিত্র সুতরাং এই বৎসরের পর তাঁরা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে (সুরা তাওবা– ২৮)।

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর পবিত্রকরনের অর্থ হলো কায়িকভাবে ঐ অপবিত্র পরিবেশ থেকে তাঁকে অপসারন। হযরত ঈসা (আঃ) এর পবিত্রকরন এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া - এ প্রকৃত সত্য আল্লাহ জানেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ খলীল হেয়াস্ (Khalil Herras) "পবিত্রকরন" এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত ঈসা (আঃ) কে অবিশ্বাসী ও দুষ্ট লোকদের হাত বা পরিবেশ থেকে মুক্তকরণ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ কাজ কখনও মৃত্যু ও কবরস্থ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এটি শুধু মাত্র তাঁকে সশরীরে বেহেশতে আরোহনের মাধ্যমেই করা সম্ভব (মুহাম্মদ খলীল হেরাস, ফাস্ল আল-যাকাল ফি রালফি ইসা হায়ান ওয়া নুযুলিহ ওয়া কাতালিহ আজ দাজ্জাবল; পৃ– ৬৬) আল হামিদী ইয়াজর (Elmali) হযরত ঈসার (আ:) পবিত্রকরণ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে বলেন, তাঁর উর্ধ্বাকাশে আরোহনের বেপরোয়া।

আর এই আমার সান্নিধ্যে উর্ধ্বে তুলিয়া নেয়ার মাধ্যমে আমি তোমাকে পরিশুদ্ধ করিব। কাফের, মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে এবং পরবর্তীতে তাদের ব্যাপারে তোমার আর কোন দায়–দায়িত্ব থাকবে না। এর মাধ্যমেই প্রকাশিত তাই এ প্রসঙ্গে অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না (The Time Religion the Language of the Quran, পৃঃ ১১১২-১৩)

পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তন

পবিত্র কোরানে হযরত ঈসা (আঃ) এর ফিরে আসা বা পুনরাগমন:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। অথবা তাঁকে হত্যাও করা হয় নাই বরং হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি এই পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এই পৃথিবীতে পুনরাগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং এ ব্যাপারে বহু প্রমান রয়েছে।

প্রথম প্রমান ঃ

যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে আমার নিকট তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর আমি তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি। অতঃপর আমার কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন । অতঃপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব

(সুরা আল ইমরান–৫৫)

এই আয়াতে "আমি তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি" বাক্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ঈসা (আঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে একটি গ্রুপের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যাদেরকে "কেয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখা হবে", মর্মে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, এখন প্রশ্ন হলো হযরত ঈসা (আঃ) এর এই একনিষ্ঠ অনুসারী কারা? তারা কি হযরত

ঈসা (আঃ) এর সময়কালীন সেই ভক্ত বা অনুসারীবৃন্দ অথবা বর্তমান সময়ের খৃষ্ঠান ধর্মালম্বী নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী?

হযরত ঈসা (আঃ) এর উর্ধ্বে আরোহনের পূর্বে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। হযরত ঈসা (আঃ) এর আলাহ্র সান্নিধ্যে গমনের পর খৃষ্ঠধর্মের মূলসূত্র অল্পদিনের মধ্যে বিকৃত হয়ে যায়। উপরন্তু তার অনুসারীগণ জীবিত থাকাকালীন সময়ে চরম নির্যাতন এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। পরবর্তী দুই শতক পর্যন্ত তার অনুসারীদের কোন রাজনৈতিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় তারা সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ কাফিরদের তুলনায় শক্তিশালী ছিল একথা বলা সম্ভব নয়। তাই অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে এই অনুসারীদের বিষয়ে বলা হয় নাই।

বর্তমান খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টধর্মের প্রান বা মূলসূত্র বলতে যা বোঝায় তা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আঃ) মানব জাতির কাছে যে মূল শিক্ষার দিয়াছেন তার সাথে বর্তমানে প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মের কোন সম্পর্কই নাই।

বর্তমানে হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারী হিসাবে দাবীদারগণ হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং অনুরূপভাবে ত্রিতত্ব মতবাদে (পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা) বিশ্বাসী। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ সবের উর্ধে। তাই বর্তমান খৃষ্টানদেরকে হযরত ঈসা (আঃ) এর সত্যিকার অনুসারী হিসাবে গণ্য করা নির্ভুল হবে না বা যথার্থ হবে না তথা বিভ্রান্তিকর হবে। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতেই এই ত্রিতত্ত্ব একটি বিকৃত বা বাতিল বা আলাহ্র অনুনোমোদিত মতবাদ হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে।

"যাহারা বলে, যে মসীহ, মরিয়ম তনয়, তিনের মধ্যে তৃতীয় তাহারা তো কুফরী করিয়াছে যদিও আল্লাহ এক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।"

(সুরা মায়িদা–৭৩)

এই ক্ষেত্রে আলোচ্য উক্তিটির "আমি তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দান করিব" ব্যাখ্যা করা হচ্ছে :

প্রথমত: বলা হয়েছে তারা হবে মুসলিম বা আল্লাহতালার কাছে আত্ম সমর্পনকারী যারা হযরত ঈসা (আঃ) এর মূল শিক্ষার বাস্তব অনুসারী। দ্বিতীয়ত ঃ বলা হচ্ছে বর্তমান খৃষ্টান ধর্মালম্বীরা মূর্তিপূজকদের অনুরূপ বিশ্বাস লালন করে থাকেন যা বিশ্বের যে কোন খৃষ্টানের সাথে আলোচনা করে বা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করলেই এর সত্যতা দেখতে পাওয়া যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে। কারণ তিনি জিযিয়া কর (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সাময়িক করাদি) রহিত বা বাতিল করবেন। অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে খৃষ্টান বা ইহুদীদের একত্র বসবাস করা তিনি সেই সময় সমর্থন করবেন না। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তার শাসনকালে সকল ধরনের বিশ্বাসীদের ইসলাম ধর্মে শামিল হিসাবে গণ্য করা হবে।

আল্লাহর নবী ও শেষ পয়গম্বর (সঃ) হযরত ঈসার (আঃ) প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ দিয়েছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই বিষয়ে হাদীস সমূহের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহর নবী বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ বিচারের দিনের পূর্বে জনগণের মাঝে নেমে আসবেন। এ বিষয়টি মুতাওয়াত্তর এর মর্যাদা লাভ করেছে। এর অর্থ হলো বিষয়টি এত বেশী সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন যা প্রজন্ম পরম্পরায়

সংরক্ষিত হয়েছে। তাই এই হাদীস সমূহের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুল (সঃ) বলেছেন:

কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রান। মরিয়ম (আঃ) তনয় অবশ্যই শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে অবতরন করে একজন ন্যায়বান বিচারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। (ক্রুশ পূজা বন্ধ করবেন)। শুকর হত্যা করবেন (স্মরন করা যেতে পারে (শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ) ও জিজিয়া কর বাতিল করবেন। সেই সময় সম্পদের এত প্রাচুর্য থাকবে যে, তা নেওয়ার জন্য কোন লোক পাওয়া যাবে না। তখন একটি সেজদার মূল্য পৃথিবী ও তার মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশী মূল্যবান হবে

(সহীহ বোখারী)

জাবীর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি রসুলকে (সঃ) বলতে শুনেছি", আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না তারা বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, এমন সময় ঈসা (আঃ) অবতরন করবেন, তাদের নেতা বলবেন, আসুন আপনি নামাজের ইমামতী করুন। কিন্তু ঈসা (আঃ) বলবেন, না আপনাদের কেহ কেহ অন্যান্যদের নেতা করেছেন আলাহতালা এই উম্মাহ্কে মর্যাদা দান করেছেন (সহীহ মুসলিম)। আবু হোরায়রা বলেন, আমি নবীকে (সাঃ) বলতে শুনেছি, "আমার ও হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যবর্তী কোন নবী নাই। যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরন করবেন তাঁকে চিনে নিও। তিনি হলেন একজন মধ্যম উচ্চতার লোক, লালচে ফর্সা, দুই প্রস্থ হালকা হল্‌দে কাপড় পরিহিত। মাথায় চুল দেখে

মনে হবে ভিজা ও পানি ঝরছে যদিও প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন পানি থাকবে না। তিনি ইসলামের জন্য লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিজিয়া কর বাতিল করবেন। আল্লাহ্ ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম ধরায় রাখবেন না, তিনি দজ্জাল ধ্বংস করবেন। দুনিয়ায় তিনি ৪০ বৎসর জীবিত থাবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হবেন। মুসলিমগণ তার ইমামতিতে নামাজ আদায় করবেন (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় প্রমানঃ

আমরা ইতোপূর্বে সুরা নিসার ১৫৫-১৫৭ নং আয়াত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। এই এর পরবর্তী ১৫৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন, কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (সুরা নিসা– ১৫১), (সুরা নিসা– ১৫৯)। আলোচ্য আয়াতে “তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এমন কেহ থাকিবে না যে, তাহার উপর ঈমান আনবেনা “এই বক্তবটি গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে আরবী ভাষা হলো– “ওয়া ইন মিন আহ্লিল কিতাবে ইল্লা লা ইউমিন্নিনা বিহি কাবলা মাওতিহি।”

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, এ বক্তবে সে বা ইহা কোরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তারা আয়াতটির এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আহলে কিতাবীদের মধ্যে এমন কেহ থাকিবে না যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী থাকবে না।

যাহোক, একই সুরার পূর্ববর্তী ১৫৭-১৫৮নং আয়াতদ্বয়ে এই “সে” সর্বনামটি সন্দেহাতীতভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, “তাহারা বলে, আমরা মসীহ, মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) মসীহকে হত্যা করিয়াছি তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাঁকে ঈসা (আঃ) হত্যা করে নাই, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই কিন্তু তাহাদের বিভ্রম হইয়াছিল। যারা এ ব্যাপারে বিতন্ডা করে বা যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন করে এ ব্যাপারে তাদের কোন বাস্তব জ্ঞান নাই। বরং তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এটা স্থির নিশ্চিত বিষয় যে, তারা তাকে (ঈসাকে) (আঃ) হত্যা করে নাই

(নিসা- ১৫৭)

আল্লাহতালা তাঁকে (হযরত ঈসাকে আঃ) তাঁর সান্নিধ্যে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ (সুরা নিসা– ১৫৮)। এই দুই আয়াতের পরবর্তী আয়াত–১৫৯। এই আয়াতে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, “সে” শব্দটি ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ বা অন্য কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিতাবধারীদের মধ্যে এমন একজনও থাকবে না যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনিবে না। কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদান করিবে (সুরা নিসা–১৫৯)। পবিত্র কোরআনে শেষ বিচারের দিনে জিহ্বা, হাত ও পা তার কৃতকর্মের সাক্ষী হবে (সুরা নুর– ২৪ ও সুরা ইয়াসীন ৬৫।) সুরা ফুসিসিলাত্‌ ২০-২৩ নং আয়াতে শ্রবনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ত্বক আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। এ সব আয়াতে, কোরআন সাক্ষ্য দিবে মর্মে কোন উল্লেখ নাই। যদি আমরা ধরে নেই যে, প্রথম বাক্যের “সে” অথবা “ইহা” কোরআনকে ইংগিত করা হয়েছে, যদিও আরবী ব্যাকরণের নিয়ম ও যৌক্তিকভাবে সেটি বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। যদি এটা তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই, তাহলে

দ্বিতীয় অর্থেই যে কোরআন অর্থে ধরে নিতে হবে, যদিও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত কোন আয়াত নাই।

তাছাড়া পূর্ববর্তী বাক্যে আল্লাহতালা তাঁকে তার নিজের সান্নিধ্যে তুলিয়া নিয়াছেন, তা অবশ্যই কোরআনের দিকে ইংগিত করা হয় নাই।

কোরআন বিগত ১৪০০ বছর যাবত ঈমানদারদের জন্য হেদায়েতকারী গ্রন্থ হিসাবে বিরাজমান ও তা আল্লাহর নিকট তুলে নেয়া হয় নাই। বরং হযরত ঈসাকেই (আঃ) আলাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে। উপরন্তু কিতাবকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদানের বিষয়টিও হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে সম্পর্কিত এবং যে সর্বনাম নির্দেশ করে (আলাহ সর্বজ্ঞ)। এই আয়াতে কোরআনের জন্য নয় বরং হযরত ঈসা (আঃ) এর দিকেই নির্দেশ করে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সেখানে ব্যক্তিগত সর্বনাম ব্যবহৃত হয় যেখানে এর আগে বা পরে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশকারী কোন শব্দ বা ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সুরা নমল এর ৭৭নং, আয়াত ও সুরা আশশুয়ারা ১৯২ আয়াত সমূহে সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিতাবধারীগণ আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে। এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। এর দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা হলো– তাঁর মৃত্যুর পূর্বে শব্দগুচ্ছ সম্পর্কিত। অনেক ব্যাখ্যাকার লিখে থাকেন যে, এটি হলো তাদের মৃত্যুর পূর্বে তারা ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিতাবধারীদের প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আঃ) এর উপর প্রকৃত ঈমান আনবে। আরবী ভাষা তত্ত্ববিদগণের মতে এটি পবিত্র কোরানের সার্বিক বা যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে আহলে কিতাবধারীদের বোঝাতে বহু বচনে “হুম” প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সুরা

আল বাইয়েনাত এর ১ -৬নং আয়াত, সুরা হাদীদ এর ২৯ নং আয়াতে, সুরা আল হাশর এর ২নং আয়াত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একবচনে "হু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, "আহলে কিতাবগণ তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনবে"।

দ্বিতীয়বার আগমনের পর অথবা তাঁর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর কায়িক মৃত্যুর পূর্বে আহলে কিতাবগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ) তাছাড়া, হযরত ঈসা (আঃ) এর যুগে ইহুদীদের কিতাবধারী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা হযরত ঈসার (আঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বরং তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল। পক্ষান্তরে এটাও বলা সম্ভব নয় বা বলা সঠিকও হবে না যে, ইহুদি ও খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) এর সময়ের পরে মারা গেছে, তাদের হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর সেই ধরনের ঈমান ছিল যে, ধরনের ঈমান কোরআন অনুযায়ী থাকা উচিত।

এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আসার পূর্বে আমাদেরকে এই আয়াতটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা উচিত। এ ব্যাপারে আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলোঃ হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহলে কিতাবধারীগণ তার উপর ঈমান আনবে। অন্য কথায় হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তনের পর বা তার দ্বিতীয় আগমনের পর সকল কিতাবধারীগণ মুসলিম তথা আত্মসমর্পনকারী হয়ে যাবে এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের বিজয় সূচিত হবে। এই আয়াতে ভবিষ্যতে হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরন করেন নাই এবং তাঁকে আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলিয়া নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থান করবেন

এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। উপরন্তু সকল কিতাবধারীগণ ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনবেন। এই ঘটনাবলী অদ্যাবধি সংঘটিত হয় নাই বরং তা অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে থাকবে। ফলে "তাঁর মৃত্যুর পূর্বে" শব্দাবলী হযরত ঈসা (আঃ) এর দিকে ইংগিত করে। অর্থাৎ কিতাবধারীগণ তাকে দর্শন করবে। তার পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবে, তাকে মান্য করবে তাকে অনুসরণ করবে। তখন তিনি জীবিত থাকবেন। এদের সম্বন্দেই হযরত ঈসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন সাক্ষ্য দিবেন। (আলাহ্ সর্বজ্ঞ)।

৩য় প্রমান ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) যে আখেরী জমানায় দুনিয়াতে প্রর্তাবর্তন করবেন, সে বিষয়টি কোরআনের অন্য একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় তাহাতে হাস্য কৌতুক বা সোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয় এবং বলে, আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা? ইহারা কেবল বাক বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত তারা তো এক বিতন্ডাকারী সম্প্রদায় সে তো ছিল আমারই এক বান্দা যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছি এবং দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম বনি ইসরাইলদের জন্য, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের মধ্যে হইতে ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইত। সুরা যুখরুফ (৫৭-৬০)। এই আয়াতগুলো বর্ণনার পর আল্লাহতালা ঘোষণা করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ বিচারের দিনের একটি নির্দশন।

ঈসা কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করিওনা এবং আমাকে অনুসরন কর। ইহাই সরল পথ(সুরা যুখরাফ– ৪১)।

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী জমানায় এই দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করবেন। কারণ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে ঈসা (আঃ) এই দুনিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। তাই তাঁর প্রথম আগমনকে আমরা কেয়ামতের আলামাত হিসাবে গণ্য করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের মাধ্যমেই তার নির্দেশ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ জমানায় এই দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবেন আর তার এই আগমনকে শেষ বিচার দিনের নির্দশন বা আলামত হিসাবে গণ্য বা বিবেচনা যোগ্য।

এই আয়াতের আরবী ভাষ্য হলো– ইন্নাহুলা –ইলমুমলিস সা'তি। অর্থাৎ "সেই মহা সময়ের চিহ্ন।" কিছু সংখ্যক লোক এই আয়াতে "হু" শব্দটি কোরআনের ইংগিতবহ বলে মনে করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আলোচ্য বিষয়। এ কারণে এই সর্বনাম 'হু' শব্দটি পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে যুক্ত এবং তা হযরত ঈসা (আঃ) এর দিকেই নির্দেশিত।

প্রকৃতপক্ষে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদগণ কোরআনের আলোচ্য এই "হু" প্রত্যয় হাদীসের মর্মানুযায়ী এটাই ঘোষনা করেছেন যে, এই তিনি হচ্ছেন হযরত ঈসা (আঃ)। SAYYID QUTB, সমসাময়িক ইসলামী বুদ্ধিজীবিদের একজন, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রমানের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন:

শেষ বিচারের দিনের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) এই দুনিয়ায় অবতরন করবেন মর্মে বহু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই মহাসময়ের নিদর্শনও এই ঈংগিত দেয়। অন্য কথায়, হযরত ঈসা (আঃ) কেয়ামত দিবসের কিছুকাল পূর্বে এই

পৃথিবীতে অবতরন করবেন। এই আয়াতটির দ্বিতীয় প্রকার পাঠে হলো– ওয়া ইন্নাহু লা–ইলমুন লি আল–সা সায়াতী। অর্থাৎ তাঁর অবতরন হলো কেয়ামতের একটি আলামত। এই আয়াতের দুই রকম পাঠ্যরীতি একই অর্থ বহন করে। হযরত ঈসা (আঃ) এর উর্ধ জগত থেকে পৃথিবীতে অবতরন অদৃশ্য জগতের একটি মহা সংবাদ মহাসত্যবাদী ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নবী (আঃ) বলেছেন এবং মহা মহিমান্বিত পবিত্র কোরআন এর ইংগিত বা নির্দেশ করা হয়েছে। এই দুটি উৎস যা কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে ছাড়া এ বিষয়ে অন্য কেহই কিছু বলতে সক্ষম নয় বা ক্ষমতাপ্রাপ্তও নয়। Al karwthuri বলেছেন, পূর্ববর্তী ধর্মীয় কিতাব সমূহে ঈসা (আঃ) এর পুনরাগমনের প্রমান হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়ে আসছে।

Omer Nasuhi Bilmen এই আয়াতটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

ইহা সন্দেহাতীতভাবে এই সংবাদই পরিবেশন করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ বিচারের দিনের কিছু কাল পূর্বে অবশ্যই পৃথিবীতে আগমন তথা অবতরন করবেন। এই পৃথিবীতে তার পুনরায় আগমন শেষ বিচারের দিনের একটি স্পষ্ট আলামত বা স্থায়ী বিধান হিসাবে বিবেচিত।

হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্য প্রকৃত পক্ষে এটি একটি অনন্য উপাধি তথা কেয়ামতের আলামতের নিদর্শন যদিও কোরআনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ইব্রাহীম (আঃ), নুহ (আঃ), মুসা (আঃ), সোলায়মান (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), দাউদ (আঃ), ইউসুফ (আঃ) ও অন্যান্য মহান পয়গম্বরদের জীবনচরিত উল্লেখ আছে। কিন্তু এইসব নবীদের কারো ক্ষেত্রেই এই উপাধি ব্যবহার করা হয় নাই। এই বিষয়টিও হযরত ঈসা (আঃ) অনন্য বৈশিষ্ট্যের দিকে নির্দেশ করে, যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থান করার পর এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

<u>প্রমান–৪</u>:

কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

যখন ফেরেশতারা বললেন, হে মরিয়ম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে, তাহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাহার নাম মসীহ ইসা ইবনে মরিয়ম। তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্যতম। তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিনত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলিবেন এবং তিনিই হইবেন পুন্যবানদের মধ্য হইতে একজন। তিনি (মরিয়ম) বলিলেন, হে আমার রব! কিভাবে আমার সন্তান হইবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি বলিলেন, ঐভাবেই আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন। যখন তিনি কোন বিষয়ে স্থির নির্দেশ দেন, সুতরাং, নিশ্চয়ই তিনি তাহার জন্য বলেন "হও।"সুতরাং ইহা হইয়া যায়। তিনি (আল্লাহ) তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল (সুরা আলে ইমরান-৪৫-৪৮)। এই আয়াতে ঘোষনা করা হয়েছে; আলাহ হযরত ঈসাকে (আঃ) ইনজিল, তাওরত। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন, "সুরা মায়িদায় বিষয়টি আবারও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

যখন আল্লাহ বলিলেন, হে মরিয়ম পুত্র ঈসা, তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার নেয়ামতের কথা স্মরন কর, যখন রুহুল কুদ্দুস দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করলাম, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় অপরিনত ও পরিনত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলিতে, আর আমি যখন তোমাকে কেতাব, হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা

দিলাম এবং যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটি হইতে পাখীর আকৃতি তৈরী করিতে অতঃপর ফুঁক দিলে, তখন উহা আমার নির্দেশে পাখী হইয়া যাইত। (সুরা মায়িদা–১১০)। এই আয়াতে "কিতাব" শব্দ পর্যালোচনা করলে আমরা ধারনা করতে পারি যে, তা কোরআনের দিকে ইংগিত করে। আমরা জানি যে, কোরআন হলো নাযিলকৃত শেষ ঐশী গ্রন্থ। তাওরাত, যবুর ও ইনজিল এই দৃষ্টিভংগীতে গ্রন্থ বলতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের অন্য একটি আয়াতে তাওরাত, ইনজিল এবং গ্রন্থ বলতে কোরআন নির্দেশ করে। তিনি আল্লাহ। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একমাত্র চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি তোমার উপর নাজেল করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব যাহা তোমার হাতের মধ্যে তথা সামনে রয়েছে যাহা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ তাওরাত এবং নজিলের সমর্থনকারী (সুরা আল ইমরান ২–৩)।

অন্যান্য আয়াতেও গ্রন্থ বলতে কোরআনকেই বোঝানো হয়েছেঃ

যখন তাহাদের নিকট যাহা ছিল (ঐশীগ্রন্থ) তাহার স্বপক্ষে আল্লাহর নিকট হইতে কিতাব আসিল, অথচ উহার পূর্ব হইতে কাফেরদের উপর তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিত। যে বিষয়ে তাদের জানা ছিল তাহা বাস্তবিক পক্ষে আসার পর তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল। তারপর কাফেরদের উপর আল্লাহর লানত বা অভি সম্পাত পতিত হইল

(বাকারা ৮৯)

আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করিয়াছি। যিনি তোমাদের উপর আমাদের আয়াত বা নিদর্শন তেলাওয়াত করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যাহা জানিতে না তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেন।

(বাকারা ১৫১)

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তৃতীয় কিতাব বা গ্রন্থ অর্থাৎ কোরআন আলাহ্‌তালা হযরত ঈসাকে (আঃ) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এটি তখনই সম্ভব ও যুক্তি সংগত যদি তিনি আখেরী জামানায় পৃথিবীতে পুনরাগমন করেন।

হযরত ঈসা (আঃ) কোরআন নাজিল হওয়ার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে দুনিয়ায় এসেছিলেন। তাছাড়া এটাও একটি প্রমান যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যখন হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করবেন তিনি ইনজিল নয় বরং কোরআন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

তিনি (হযরত ঈসা (আঃ) তোমার প্রভুর কিতাব আল্লাহ্‌র কোরআন ও নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর এই বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান যে ঈসা (আঃ) এই দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করে কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বিশ্ব পরিচালনা করবেন যা কোরানের উক্ত আয়াতের বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। (আলাহ্‌ সর্বজ্ঞ ও হযরত ঈসা (আঃ) এ ব্যাপারে আর একটি বিষয় নাজিল করা হয়েছে। যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে নাজিল করা হয় নাই বা উল্লেখ করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) এর উপর তৈরীতে সহীফাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর, দাউদ (সঃ) এর উপর সাম, যে সমস্ত কিতাব নবী (আঃ) পূর্বে নাজিল করা হয়েছে। কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ সব কিতাব তারা জানেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, তিনি তার পরবর্তী সময়ে নাজিলকৃত

কিতাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটিও একটি নিদর্শন যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) আখেরী জমানায় দুনিয়ায় পুনরায় আবির্ভূত হয়ে তার সময়কালের পরবর্তীতে নাজিলকৃত কিতাব–অর্থাৎ কোরআন অনুযায়ী বিশ্ব পরিচালনা, নিয়ন্ত্রন তথা নির্দেশনা দান করবেন (আলাহ্ সর্বজ্ঞ)।

প্রমান–৫:

পবিত্র কোরআনে সুরা আল ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

নিশ্চয়ই আলাহ্র নিকট ঈসার উদাহরন তো আদমের উদাহরনের মতই। এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে পুনরাগমনের একটি ইংগিত হতে পারে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যারা কোরআন গবেষণা করেন। তারা বিবেচনা করেন যে, এই আয়াতে এটাই নির্দেশ করে যে, উভয় পয়গম্বরের কোন পিতা ছিল না। এই দুই জন পয়গম্বরকে আল্লাহর হুকুমে। "কুন" এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। এই আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। হযরত আদম (আঃ) যেমন বেহেশতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে দুনিয়ায় অবতরন করেন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে আখেরী জামানায় পৃথিবীতে অবতরন করবেন। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ) অতএব, আমরা দেখতে পাই কোরআনে হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রমান–৬:

সুরা মরিয়মে হযরত ঈসা (আঃ) উর্ধ্বোগমন বা আলাহ্তালার তাঁকে তুলে নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে:

ঈসা বলেন, আমার প্রতি শান্তি যে দিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, সেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় উখিত হইব (সুরা মরিয়ম– ৩৩)।

এই আয়াতের সাথে যদি সুরা আল ইমরানের ৫৫নং আয়াত একত্রে মিলিয়ে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য দেখতে পাওয়া যায়। সুরা আলে ইমরানের উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলিয়া নেয়া হয়েছে। এই আয়াতে তাঁর মৃত্যু বা হত্যার কোন তথ্য দেওয়া হয় নাই। সুরা মরিয়মে হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুর কথা সংবাদ দেয়া হলো। এই দ্বিতীয় মৃত্যুর বিষয়টি শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভব হতে পারে যদি তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে মৃত্যু বরণ করবেন। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

প্রমান ৭ ঃ

সুরা মায়িদা ও সুরা আল ইমরানে উল্লিখিত “কাহলান” শব্দটিও হযরত ঈসা (আঃ) এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আরো একটি প্রমান। আয়াতে উল্লেখ আছে।

স্মরন কর, যখন আল্লাহ বলিলেন ঈসা, মরিয়ম তনয়, তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ। স্মরন করঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে (কাহলান–সুরা মায়িদা– ১১০)। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় ও পরিণত বয়সে (কাহলনে) এবং সে হইবে পুন্যবানদের একজন (সুরা আল ইমরান– ৪৬)। পবিত্র কোরআনে শুধুমাত্র এই দুই আয়াতে “কাহ্লান” শব্দটি দেখা যায় এবং তা শুধু হযরত ঈসা (আঃ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। আলোচ্য শব্দটি হযরত ঈসা (আঃ) এর পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার কথা বোঝাতেই তা ব্যবহার করা হয়েছে যা সাধারনভাবে ৩০-৫০ বৎসর বয়স সীমা বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থৎ সে আর অল্প বয়স্ক নাই বা তিনি একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণতি লাভ করেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই শব্দটির অর্থ হিসাবে ৩৫ বৎসর বয়স নির্ধারন করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) তিরিশের কিছু বেশী বয়সে উর্ধাকাশে গমন করেন। অতঃপর পৃথিবীতে অবতরন করে ৪০ বৎসর এখানে অবস্থান করবেন। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এই পৃথিবীতে আগমনের পরই তিনি বয়োবৃদ্ধ হবেন।

কোরআনের এই আয়াতটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই বক্তব্য শুধু হযরত ঈসার (আঃ) ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। সকল পয়গম্বরই (আঃ) জনগণকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। তারা ধর্ম প্রচার করেছেন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসাবে। কিন্তু অন্যান্য নবীদের (আঃ) ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বক্তব্য বাক্য কোরআনে ব্যবহার করা হয় নাই। এই উক্তিটি শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) ক্ষেত্রে ব্যবহার করায় তাঁর অলৌকিক অবস্থান নির্দেশ করে। কারণ এই আয়াতে দোলনায় এবং পূর্ণ বয়স্ক এই বিষয় দুইটি অলৌকিক সময়কালকেই নির্দেশ করে।

ইমাম তাবারী আলোচ্য আয়াত দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

সুরা মায়িদার ১১০নং আয়াতের মর্মানুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) তার বয়সসীমা পূর্ণ করার জন্য এবং পূর্ণ বয়স্ক হিসাবে জনগণের কাছে ধর্মের বানী প্রচার করার জন্য বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আগমন করবেন। কারণ তিনি অপেক্ষাকৃত খুব কম বয়সে উর্ধে গমন করেছিলেন। সুরা আল ইমরান এর ৪৬নং আয়াত অনুযায়ী প্রমানিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন। আহল আল সুন্নাহর এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে। কারন হলো, এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পূর্ণ

বয়স্ক হিসাবে লোকের সাথে কথা বলবেন। পৃথিবীতে আসার পরই কেবলমাত্র তিনি পূর্ণ বয়স্ক হতে পারবেন।

যাহোক, অনেকে বলে থাকেন, যখন পূর্ণ বয়স্ক ব্যাপারটি প্রকৃত অর্থের অনেক দূরবর্তী হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা কোরআনের সাধারন যুক্তি পর্যালোচনা করেন না। তারা দাবী করেন যে, পয়গম্বগণ (আঃ) সব সময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত যা সকল নবীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এটা স্থির নিশ্চিত বিষয় যে, আল্লাহর নবীগণ (আঃ) পূর্ণতাপ্রাপ্ত যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহতালা প্রতিপালন করেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহতালা সুরা আহকাফ এ আল্লাতালা পূর্ণ বয়স্কদের মানুষের বয়সের একটি সাধারন সীমারেখা বর্ণনা করেছেন তা হলো ৪০ বৎসর।

আমি মানুষকে তাহার মাতা–পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারন করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চলিশ বৎসরে উপনীত হয়। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সমর্থ দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা–মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছো। তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎ কার্য করতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান–সন্তিদিগকে সৎকর্ম পরায়ন কর। আমি তোমরাই অভিমুখী হইলাম এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদের একজন।

(আহকাফ– ১৫)

কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য তথ্য ও "কাহলান" শব্দের মর্মানুযায়ী বলা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করবেন। পবিত্র কোরআনে অন্যান্য লোকের উদাহরন রয়েছে, যারা এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন এবং পুনরায় ১০০ বৎসর পর পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। কোরআনে মৃত্যুর ১০০ বছর পর দুনিয়াতে পুনরায় এসেছেন এমন একাধিক ব্যক্তির উদাহরণও রয়েছে।

দুনিয়া ত্যাগ করে অন্য জগতে গিয়েছেন এবং ১০০ বছরের পর এই দুনিয়ায় প্রত্যাগমন করেছিলেন। এমন ঘটনা ও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

একশ বছর পর যার পুনরুত্থান হয়েছিল ঃ

কোরআনে এমন একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে যিনি ১০০ বছর মৃত ছিলেন যা সুরা বাকারায় বর্ণিত আছে ঃ

অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই যে, একটি পথের উপর পথ চলতে ছিল যাহা ছিল ধ্বংসস্তুপে পরিনত। সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ কিভাবে ইহাকে জীবিত করিবেন ইহাদের মৃত্যুর পর? সুতরাং আল্লাহ তাহাকে ১০০ বৎসর মৃত অবস্থায় রাখিলেন। অতঃপর পুনর্জীবিত করলেন। এবং বলিলেন, তুমি কতদিন এই অবস্থায় ছিলে? সে বলিল আমি এখানে একদিন অথবা তার কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিলেন, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে। সুতরাং, যে তুমি তোমার খাদ্য পানীয়ের দিকে তাকাও, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গাধার দিকে তাকাও এবং তোমাকে মানব জাতির জন্য নির্দশন করা হইয়াছে। এবং গাধার হাড্ডির দিকে তাকাও।

কিভাবে আমরা উহাতে অস্থি এবং মাংস সংযোজন করি। সুতরাং যখন উহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল। সে বলিল, জানিলাম আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।(সুরা বাকারা– ২৫৯)।

কোরআনের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই বরং তাঁকে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোরআনের বর্ণিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহতালা এমনকি একজন মৃত ব্যক্তিকে একশত বৎসর পর জীবন দান করেছেন মর্মে কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আসহাবে কাহাফগণ শতশত বছরের পর পুনরুত্থিত হয়েছেন:

গুহার অধিবাসীদের ঘটনাটি কোরআনে সুরা আল কাহফ এ বর্ণিত হয়েছে।

তাঁরা ছিল কিছু সংখ্যক যুবক। তারা তদানীন্তন স্বৈরাশাসকের নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে তারা শতাধিক বছর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে এবং পরবর্তীতে ঘুম থেকে জেগে উঠে মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন যুবকরা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল, তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের রব। তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাদের উপর রহমত দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকে সুশোভিত করিয়া দাও। অতঃর আমরা গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাদের কানে পর্দা তুলিয়া দিলাম। পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাহাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পাওে (সুরা কাহাফ– ১০–১৫)।

তুমি ধারনা করিওনা যে, তাহারা জাগ্রত। বস্তুত তাহারা ঘুমাইয়া রহিয়াছে এবং আমরা তাহাদেরকে ডান ও বাম দিকে পাশ ফিরাইয়া দেই। এবং তাহাদের কুকুর গুহার মুখের সামনে পা দুইটি বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। তুমি যদি তাহাদেরকে উকি মারিয়া দেখিতে তাহা হইলে পিছন দিকে ফিরিয়া পলায়ন করিতে এবং ভয়ে আতংকগ্রস্থ হইয়া পড়িতে।

আমরা তাহাদেরকে পুনরায় উঠাইলাম যাহাতে তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নেয়। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, তোমরা এখানে কত কাল অবস্থান করিয়াছ? তাহাদের মধ্য হইতে একদল বলিল, আমরা এইখানে একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছি। অন্য দল বলিল, তোমরা এখানে কতক্ষন অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদের রব ভাল জানেন। সুতরাং তোমাদের কোন এক ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা দিয়ে শহরের দিকে পাঠাইয়া দাও। অতঃপর সেই দেখুক কোন খাদ্য উত্তম যে, তোমাদের জন্য শহর হইতে খাদ্য নিয়ে আসুক এবং সে যেন ভদ্রতার সাথে পথে চলে এবং আমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু না জানায় (সুরা কাহাফ ১৮–১৯)।

পবিত্র কোরআনে এই যুবকদের গুহায় অবস্থানকাল সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয় নাই বরং ইংগিত করা যাচ্ছে যে, কিছু সময়কাল তাহারা অবস্থান করে। লোক ধারনা করে যে, এই সময়কাল যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ছিল ৩০৯ বছর। আল্লাহ বলেন, তাহারা (কাহাফবাসীরা) তাহাদের গুহায় তিনশত নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছে। তুমি বলিয়া দাও তাহারা তথায় কতকাল অবস্থান করিয়াছে তাহা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত রহিয়াছেন। যিনি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর গায়েব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। তিনি কতই

না সুন্দর দেখেন এবং শোনেন। তিনি ব্যতীত তাহাদের জন্য আর কোন সাহায্যকারী নাই। তিনি তাহার হুকুমের মধ্যে কাউকে শরীক করেন না (সুরা কাহাফ ২৫–২৬)।

সাধারনভাবে কোন লোকই এত দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। আমরা যেমন ঘুম সম্পর্কে জানি এই আসহাব কাহাফের ঘুম অনুরূপ নয়। বরং এই ঘুমকে অন্য কোন অলৌকিক মাত্রায় বিচার করতে হবে। যে স্থান সময়ের অনেক উর্ধে এবং পরবর্তীতে আবার তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে স্বভাবিক জগতে ফেরত পাঠানো হয়।

অনুরূপভাবেই হযরত ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করবেন। অতঃপর আলাহ্‌তালা তাঁকে যে অতি সম্মানজনক দয়িত্ব প্রদান করেছেন তা প্রতিপালন করবেন। যেমন সুরা আরাফে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) বলেন, তোমরা পৃথিবীতে জীবিত থাকবে এবং তাহাতেই মৃত্যুবরন করবে এবং তথা হইতেই তোমাকে বাহির করা হইবে (সুরা আরাফ– ২৫)। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি অন্যান্য সাধারন ও স্বাভাবিক মানুষের মতই এই পৃথিবীতে মৃত্যু বরন করবেন (আলাহ্‌ সর্বজ্ঞ)।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে আল হাদীস

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে জীবিত অবস্থান বর্তমান এবং আখেরী জমানায় দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করবেন। এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে। এ সব গুলির মধ্যে সায়াবনীর। ইমাম মালিক (রঃ) এর আলমুয়াত্তাহ সহী Khuzayma ও Ibn Hibban ইবনে হাম্বল (রাঃ) এর মুসনাদ ও আল–তায়ালিসি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহের মধ্যে অন্যতম হিসাবে বিবেচিত। তাছাড়া অনেক ইসলামী বুদ্ধিজীবি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে বিশ্লেষণ ধর্মী পুস্তক রচনা করেছেন। যা দুর্লভ উৎস হিসাবে পরিচিত। এ ইসলামী চিন্তাবিদদের শীর্ষে রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) হানাফী মাহাযাবের। আল ফিকাহ আল আকবর পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) লিখেছেন ঃ

দজ্জাল, (Antichrist) ইয়াজুজ ও মাজুজ (Go and Magog) এর আগমন বাস্তব সত্য। সূর্য পশ্চিমে উদয় হবে এটি একটি বাস্তব সত্য। অনুরূপভাবে হযরত ঈসার (আঃ) বেহেশত থেকে অবতরন ও সত্য। কিয়ামতের অন্যান্য আলামত বা নিদর্শনাবলী যা নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য হাদীসে উল্লেখিত আছে তা বাস্তব সত্য।

হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরন বা প্রত্যাবর্তন বিষয়ক হাদীসসমূহ হলো “তাওয়াতুর”। এটি এমন একটি বিশেষ পরিভাষা যা সমস্ত হাদীস বিভিন্ন উৎস থেকে সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বংশ পরম্পরায়, সংরক্ষিত বিধায় সকল ধরনের বিভ্রান্তি ও সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সাধারনভাবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ বিভিন্ন হাদীস বিশারদ কর্তৃক বর্ণিত। তাই এগুলোর মধ্যে কোন ধরনের ভুলের অবকাশ থাকে না। ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আল যুরজানী এ তত্ত্ব বা মতবাদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

সাধারনভাবে নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহে বিভিন্ন বর্ণনকারীদের মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী ঐতিহ্যের দ্বারা সুপ্রমানিত। কারণ এতবেশী সংখ্যক বর্ণনাকারী কোন মিথ্যার উপরে্ একমত হতে পারেন না। যদি বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শব্দ, অর্থ ও ভাষা যদি সংগতিপূর্ণ হয় তাহলে শব্দের নির্ভরতা নিশ্চিত বলা হয়। যদি অর্থ বিষয়ে মিল থাকে কিন্তু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে অমিল থাকে তাহলে বলা হয় তত্ত্বের নির্ভরযোগ্যতা তথা সঠিকতা (আলি–সায়ীদ আল শরীফ), জাফর আল–আমানী ফি সারাহ মুখতাছার আল–সায়ীদ আল শরীফ আল জুরযানী ফি মুসতালাহ্ আল হাদীস, পৃ– ৪৬।)

আমরা কিছু নির্বাচিত হাদীস উদ্বৃত করছিঃ

- হযরত মরিয়ম (আঃ) তনয় হযরত ঈসা (আঃ) অবশ্যই পৃথিবীতে অবতরন করবেন এবং ন্যায়বান শাসক ও বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ইমাম নাওয়বী সহীহ মুসলিমের পর্যালোচনা)।

- হযরত মরিয়ম (আঃ) এর পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) যতদিন না পৃথিবীতে সুশাসক ও ন্যায়বান বিচারক হিসাবে আসবেন ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত হবে না।

(সুনান ইবনে মাজাহ)।

- সেই সত্ত্বার কসম, যার যাতে আমার প্রান। হযরত মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অচিরেই তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ন শাসক হিসাবে অবতরন করবেন।

(সহীহ বোখারী)

- হযরত ঈসা (আঃ) ও আমার (হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মধ্যে অন্য কোন নবী নাই। তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে অবতরন করবেন। তাকে দর্শন করে তাঁকে তোমরা চিনে নিও। তিনি একজন মধ্যম আকৃতির পুরুষ হবেন। তাঁর গায়ের রং হবে লালচে ধরনের সাদা। তিনি হলুদ রং এর দুই প্রস্থ কাপড় পরিধান করবেন। তার চুল থেকে পানি ঝরতে থাকবে। যদিও তখন কোন বৃষ্টি থাকবে না। তিনি জনতার সাথে ইসলামের জন্য সংগ্রাম করবেন। তিনি দজ্জালকে (Antichrist) হত্যা করবেন বা অকার্যকর করবেন। অতঃপর পৃথিবীতে ৪০ বৎসর অবস্থান করবেন। এরপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। মুসলিমরা তাঁর জন্য দোয়া করবেন

(সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম)

- হযরত মরিয়ম (আঃ) এর পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে অবতরন করবেন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদেরকে নেতৃত্ব দিবেন, তখন তোমরা কি করবে?

(সহীহ মুসলিম)

- হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) তখন পৃথিবীতে অবতরন করিবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁকে সালাতের ইমামতি করার জন্য আহ্বান জানালে তিনি বলবেন, না আপনাদের অনেকে অন্যদের উপর নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত

(সহীহ মুসলিম)

হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এ শতকে আগমন করবেন:

আহলে সুন্নাহ এর বিখ্যাত ও সম্মানিত বুদ্ধিজীবীগন যাদের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ ও মকতুবাত এ ইমাম রাব্বানী, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আল্লাহতালা প্রতি শতকে ধর্মের মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে ও ধর্মে যে সব কুসংস্কার ও ধর্মবিরোধী কার্যক্রম অনুপ্রবেশ করে তা থেকে ঐ ধর্মকে মুক্ত করে ধর্মের মূল ধারায় ফিরিয়ে আমার জন্য একজন সংস্কারক প্রেরণ করেন।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহতালা প্রতি শতকের প্রথম দিকে একজন ধর্মীয় সংস্কারক প্রেরণ করেন, যিনি ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন কুসংস্কার, বিদআত ও অতিরিক্ত যা রয়েছে তা থেকে ধর্মকে মুক্ত করবেন (সুনানে আবু দাউদ)।

আমাদের নবী (সঃ) এর থেকে একটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ইসলামী বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ১৪০০ শতকে আবির্ভূত হবেন।

হযরত ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) কেন্দ্র করে জনগণ একত্রিত হবে ১৪০০ হিজরী বৎসরে। (রিসালাত আল হুরুজ আল মাহ্দী, পৃ– ১০৮)।

ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সমগ্র বিশ্বে এই শতকে প্রবর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে দজ্জালের (AntiChirst) মতবাদ তথা আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক মতবাদ ও পদ্ধতি সমাজজীবন থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত হবে। কিন্তু এই অগ্রগতির ধারা ১০০ বছর বজায় থাকবে। অতঃপর বিশ্ব সমাজ জীবনে ১৫০০ শতকে (হিজরী) নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। আহলে আল সুন্নাহ এর একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও হাম্বলী মযহারের প্রতিষ্ঠাতা। হযরত ইমাম হাম্বল তিনি একটি হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, মানব জাতির ইতিহাস ৫৬০০ বছরের পুরনো আর এই হিসাব তাঁর পর্যন্ত। আহমদ ইবনে হাম্বল তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই পৃথিবীর বয়স পাঁচ হাজার ছয়শত বছর। (আল বোরহান ফি আলামত আল মাহ্দী আখির আল জামান, পৃ– ৮৯)।

অনেক হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এই পৃথিবীর বয়সসীমা ৭০০০ বছর। ইমাম ইবনে মালিক (রাঃ) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বর্ণনা করেন, এই পৃথিবীর সময়সীমা আখেরাতের হিসাবে ৭ দিন। আল্লাহতালা বলেন, তোমার প্রভুর বিচারে একদিন হলো তোমাদের গণনায় ১০০০ বছর। আলাহ্ এই পৃথিবীর বয়স ৭০০০ বছরের সমপরিমান নির্ধারন করেছেন। এই সময়কালের পূন্য কর্ম

সমূহের পরিমান ৭০০০ বছরের সমপরিমান। যদি কেহ তার ভাইয়ের কোন অভাব পূরন করে তাহলে তা আল্লাহর পথে সমস্ত দিন রোজা রাখা ও সমস্ত রাত্র আলাহর ইবাদতে থাকার সামিল।

ইবন জায়েদ আল জুহানী বর্ণনা করেন, আমি রসুলকে(আঃ) বলিলাম, এই স্বপ্নে একটি সাত স্তর বিশিষ্ট মেহ্‌রানেব সবচেয়ে উপরের স্তরে রসুল (সঃ) উপরিষ্ট অবস্থায় দেখলাম। রসুল (সঃ) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তুমি যে ৭ স্তর বিশিষ্ট মেহ্‌রাব দেখেছো তার অর্থ হলো এই পৃথিবীর বয়স হলো ৭০০০ বছর।

১৩০০ শতকে সৈয়দ নুরসী উল্লেখ করেছেন ইসলামী ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রাধান্যের সময় ১৫০০ বছর। তিনি বলেন, ১৫০০ বৎসর পর্যন্ত মুসলিমগণ সমগ্র বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এই সময়ের পর ইসলামী সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ শেষ হয়ে যাবে এবং আখেরী জমানার শেষ দিকে অবিশ্বাসী ও কাফিরদের প্রাধান্য হবে যা ১৫৪৫ বছর (হিজরী বর্ষপঞ্জি হিসাবে) পর্যন্ত বলবৎ থাকবে (আল হাদীস)।

আমার উম্মাহর মধ্যে একটি দল শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পর্যন্ত থাকবে।

আমার উম্মাহর মধ্যে একটি দল। এই বাক্যগুলির আবজাদ গননা (Abjad Numerology) অনুযায়ী আরবী ১৫৪২ (২০১৭) অর্থাৎ এই সময়কাল পর্যন্ত এই উম্মাহর প্রাধান্য অব্যহত থাকবে। সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে এটি আবজাদ গণনার ফল দাঁড়ায় ১৫০৬ (২০৮২) এর অর্থ হলো– ২০৮২ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ,

আলোকিত, প্রাধান্য ও বিজয়ী থাকবে। এরপর তাদের পরাজয় বা নৈতিক অবক্ষয় পুনরায় শুরু হবে। পরবর্তীতে ১৫৪২ (২১১৭), "আল্লাহ ২৩ দিন ইচ্ছা করেন, "এই শব্দগুচ্ছের হিসাব অনুযায়ী যে সময় দাঁড়ায় তা হলো ১৫৪৫ (২১২০)। বিখ্যাত সুন্নী ইসলামী চিন্তাবিদ আল বারজানী বলেন, এই পৃথিবীর সময় সীমা ১৬০০ হিজরীর অধিক নয়। অর্থাৎ আখেরীতি জামানা হিজরী ১৫০০ শতকের মধ্যেই আসবে।

আলামা সুয়তী একটি হাদীসের মর্মানুযায়ী বক্তব্য রেখেছেন যে, আমাদের নবী (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাহ এর আয়ুষ্কাল ১০০০ বছর তবে ১৫০০ বছরের অধিক নয়। (মুহাম্মদ ইবন আব্‌দ আর রসুল বারজানী, আল ইসাহ্‌ আহ্‌লি আশরাত আস্‌সাহ, The Portents of the Doomsday, পৃ- ২৯৯)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস ও প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামী ১৪০০ শতকে (হিজরী) আমরা বসবাস করছি এই শতকে হযরত মাহদী (আঃ) আগমন করবেন। এই শতকেই হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরন করবেন। হযরত ইমাম মাহদীর উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে ইসলামের নৈতিক বিজয় সূচিত হবে এবং সমগ্র বিশ্ব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসবে। (সুযুতী আল কাসকু আন মুজেয়াবাতী হাজিহিল উম্মাহ আল আলফু আল হায়ী লিল কাতাই; ২/২৪৮) এবং (তকসীর রহুল বায়ান বাসায়ী ৪/২৬২, আহমদ বিন হাম্বল, কিতাব আল ইলাল, পৃ- ৮৯)।

ঈমানদারগণ মসীহ দজ্জাল এর ফিতনা তথা দুঃখ কষ্ট থেকে হযরত ইসা (আঃ) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে না।

দজ্জাল (Anti Chirst) এর অর্থ মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক। যে ভাল ও মন্দের সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সংশয়, বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। যে কোন বস্তুকে তার স্বরূপ আচ্ছাদিত করে, ফলে প্রকৃত সত্য তথা বাস্তব দৃশ্যমান হতে দেওয়া হয় না। একটি মন্দ দুষ্ট, অসৎ, অশুভ, স্বত্তা যে সর্বত্র বিরাজমান সে এমন একজন যে, আখেরী জমানায় উপস্থিত হবে। সে সকল ধরনের জঘন্য নির্মম, অসৎ, প্রবঞ্চনা, অপকর্ম বা কৃতকর্মের হোতা, উৎস বা ফিতনার কেন্দ্রবিন্দু হবে।

প্রকৃতপক্ষে দজ্জাল একজন মানবীয় সত্তা, অথবা এটি একটি মতবাদ, আদর্শ বা কার্যক্রম ও চিন্তাধারা হতে পারে যা সকল প্রকার ধর্মীয় সৎ চিন্তার ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। অনেক হাদীসে দজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে দজ্জালের মতবাদ, নৈতিক চিন্তা, চেতনা ও কর্মপদ্ধতি, ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনটি জিনিস রয়েছে যা জাহির বা বাহির বা প্রকাশিত হলে যার পূর্বে যদি ঈমান না থাকে, তাহলে তার কোন উপকারে আসবে না, তা হলো ঃ দজ্জাল, পশু ও পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় (আল তিরমিজি)।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও হানাফী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, যে সমস্ত হাদীসে দজ্জাল ও আখেরী জমানার নিদর্শন বর্ণিত আছে সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ

দজ্জালের জাহির হওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব সত্য, পশ্চিমে সূর্যোদয় সত্য, হযরত ঈসা (আঃ) এর বেহেশত থেকে অবতরন, শেষ বিচারের দিনের

অন্যান্য নিদর্শনাবলী বা আলামত সমূহ, যা নির্ভরযোগ্য ও প্রমান্য হাদিস সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে এ সবই বাস্তব সত্য। (আবু হানীফা, নুমান ইবন সবিত)।

আমাদের নবীর (সঃ) হাদীসে দজ্জাল ও তার বৈশিষ্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। দজ্জাল ধর্মের সঠিক পথ থেকে জনগণকে বিচ্যুত করবে। যে মন্দকে ভাল, ভালকে মন্দ হিসাবে তার অনুসারীদের কল্পিত সুবিধা ও (যারা তাকে মান্য বা অনুসরন করবে না তাদেরক নির্যাতন করবে) সমগ্র বিশ্বে বিশৃংখলা সৃষ্টি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত উসকে দিবে, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কাজ করবে এবং এসব অবৈধ কাজ করার জন্য লোকদের বাধ্য করবে। দজ্জালের সময়ে প্রকৃত ঈমানরা কঠিন আপদ, বিপদ ও বিষয়ের সম্মুখীন হবে এবং অধিকাংশ লোক তাদের ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।

দজ্জালের আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলবে। বিশ্ব মানবতা গভীর সংকট বিপদ-আপদ ও মহা বিপর্যয় ও নির্যাতনের সম্মুখীন হবে। যেহেতু দজ্জালের প্রধান শিকার হবে ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা ও প্রকৃত ঈমানদারগণ তাই এই সময়টি প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য বিশেষ কষ্টকর ও অসুবিধাজনক হবে। বহুলোক দজ্জালের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তার অনুসারী তথা ঈমানহারা হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পৃথিবীর সকল বিবেকবান ও ঈমানদারদের প্রচন্ড বিরোধিতা করা উচিত হবে। এই পরিস্থিতি উত্তরনের পক্ষে ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করতে হবে। এভাবেই আল্লাহতালা চাইলে তাদের বিজয় সূচিত হবে। আমদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, মানব জাতির ইতিহাসে এই ব্যক্তি (দজ্জাল) দুষ্ট, পাপী, নীতিহীন ও অনিষ্টকর ব্যক্তি পূর্বে কখনও পৃথিবীর বুকে আগমন

করেনি এবং এ ব্যাপারে ঈমানদারদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। এই সতর্কবানী বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

আমি এসব তোমাদের কাছে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করছি, যাতে তোমরা বিষয়টি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারনা পাও ও দজ্জালের ফাঁদ বা থাবা তথা আক্রমন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারো এবং তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এ সম্পর্কে বলতে পারে। কারণ সকল ধরনের ফিতনার মধ্যে দজ্জালের ফিতনাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

(নায়াম ইবন মাসুদ, ইসমাইল মুতলু)

(Sign of the Last Day, Mut Publication, Istanbul : ৯২-৯৩)

রসুল (সঃ) এর এই উপদেশ দজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় পাওয়ার জন্য মোনাজাত করা মুসলমান জাতির প্রধান দিকনির্দেশনা হিসাবে কাজ করছে। মুসলমানদের বিভিন্ন উপদল, গোত্র, নির্বিশেষে তাদের ফরজ নামাজে ৫ বার দজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করার জন্য মোনাজাত করে থাকে। রসুল (সঃ) এ ব্যাপারে ঈমানদারদের জন্য যে মোনাজাত শিখিয়েছেন তা হলোঃ আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুল (সঃ) বলেছেনঃ

যখন কেহ নামাজে তাশাহুদ, পাঠ করে, সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে ৪টি বিপদের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে বলবে, হে আল্লাহ, তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি বা আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মরনের পরীক্ষা থেকে এবং মসীহ আল দজ্জালের অপকারিতা ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা করো।

(সহীহ মুসলিম)

নবী (সঃ) এই মুনাজাত তাঁর সাহাবাদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক পাঁচ বার নামাজের শেষে এই মুনাজাত করার উপদেশ দিয়েছেন। এ থেকে দজ্জালের ফিতনার গুরুত্ব ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় কত গুরুত্ব বহন করে তা সহজেই বোঝা যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ইসলামী চিন্তাবিদগণ মুনাজাতে এই শব্দগুলি যোগ করেছেন– আলাহুম্মা আজিরনী মিন ফিতনা আল মসীহ্ আল দজ্জাল ওয়া আল সুফীয়ান - হে আল্লাহ! আমাদেরকে মসীহ্ আল দজ্জাল ও সুফীয়ানদের বিপদ বা ফিতনা থেকে রক্ষা করো।

দজ্জালের ফিতনার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি বিবেচনা করে ঈমানদারগণ তাদের নামাজের পর নিজেদের মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য ও করুনা ভিক্ষা করো।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানরা মানবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দজ্জালের জন্য প্রস্তুত আছে। যাহোক, দজ্জালের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতিই হলো হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন।

হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বার আগমনের এটাই প্রমান করবে যে, মুসলিমরা দজ্জালের ফিতনার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট যে, দোয়া করে তা কবুল করা হয়েছে। কারণ দজ্জালের ফিতনার একমাত্র সমাধান হলো হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যমে। হাদীসের বর্ণনা মতে, এটাই বাস্তব সত্য।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা কে (আঃ) যখন দেখবে, তখন লবন যেমন পানির মধ্যে গলে যায়, দজ্জাল সেই রকম ভাবে গলে যাবে। কোন কোন হাদীছে হযরত ঈসা (আঃ) কিভাবে দজ্জালকে নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর করবেন সেটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

বিশ্বব্যাপী যখন দজ্জালের কুপ্রভাব, অত্যাচার, নির্যাতন ছড়িয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ মসীহ, ঈসা (আঃ) মরিয়ম তনয়কে প্রেরণ করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে দজ্জালের এর জেরুজালেমের নিকট তেল আবিবের কাছে (Ludd) এ দেখা হবে। তখন তিনি দজ্জালকে ধ্বংস করবেন।

(সহীহ মুসলিম)

হযরত ঈসা (আঃ) কে যখন আলাহ্‌র দুশমন (দজ্জাল) দেখবে, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন লবন পানিতে গলে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) যদি তাকে আক্রমন নাও করেন তবুও দজ্জাল সম্পূর্ণভাবে গলে যাবে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহতালা, হযরত ঈসা (আঃ) এর হাতেই দজ্জালের ধ্বংস নির্ধারিত করছেন।

(সহীহ মুসলিম-৬৯২৪)

হযরত ঈসা দজ্জালকে অশুভ ও হিংস্র অচিরেই প্রত্যাবর্তন করবেন তখন তিনি করবেন। তখন তিনি দজ্জালকে ধ্বংস করবেন।

(Treatise on the second coming of the Messiah, Istanbul: Ekmel Publishers, GP 121).

এ কারনে ঈমানদের জন্য ও যারা দজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায় তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরা সর্বান্তিকরণে হযরত ঈসাকে (আঃ) সমর্থন করবেন এবং তার প্রকৃত আগমনের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্য সর্বোকৃষ্ট পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সবকিছু নিয়োজিত রাখবেন এবং সম্ভাব্য সবকিছু করবেন।

এক দিকে মুসলিমগণ অতি অবশ্যই দজ্জালের প্রবঞ্চনা, কুটচক্রজাল উন্মোচন করবেন এবং দজ্জালী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল চিন্তাধারা মতবাদ ও তত্ত্বের বিরুদ্ধে কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম অব্যহত রাখবেন। অন্যদিকে, হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর তিনি যে, ব্যাপক নৈতিক, ধর্মীয়, আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শিক সংগ্রাম শুরু করবেন সেটি সমর্থন করার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

পবিত্র কোরআনে, প্রদত্ত তথ্য ও হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অতি সন্নিকটে।

এই ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষনে যারা দেখার গৌরব অর্জন করতে চান, তারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে এই সম্ভাবনার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাবেন তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা। একই সাথে তাদের ব্যক্তিগত দায়–দায়িত্ব মহান কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হবে তারা এবং তাদের জন্য আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) আগমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কিত পুস্তকের পর্যালোচনা

বদিউজ্জামান সৈয়দ নুসরীর রিসালা আন নূর গ্রন্থে হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, কোরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, কিভাবে আখেরী জমানায় হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কিভাবে খৃষ্টানদের সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরন করে তাদের ভ্রান্ত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে তাঁকে অনুসরন করার কথা উল্লেখ করবেন, কিভাবে মুসলমান ও খৃষ্টানগণ একত্রিত হয়ে একযোগে কাজ করবে। কিভাবে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সমগ্র বিশ্বে ইসলামী ধর্মীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবেন ইত্যাদি। যাকে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ১৩ শতকের মুহাদ্দেদ বা মন্তব্য বা ধর্মীয় সংস্কারকের মর্যাদা দেওয়া হয় তার।

জনাব বদিউজ্জামানের বক্তব্য বা মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে ভুল বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে কিছু সংখ্যক লোক এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা (আঃ) এর "সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব" প্রকৃতপক্ষে আগমনই করবেন না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদিউজ্জামানের বক্তব্য কখনও এ ধরনের অর্থে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা হয়নি। বরং রিসালত আননুর পুস্তকে জনাব বদিউজ্জামান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং আখেরী জামানায় এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

"সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব" এর মতবাদ হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মাহ্দী (আঃ) এর মত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার কোন প্রশ্নই আসেনা যা

কোরানে বর্ণিত আল্লাহতালার আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। কোন পয়গম্বর বা নবী সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন না।

কোরআনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত পয়গম্বরের জীবন, তাদের সংগ্রাম তাদের বানী ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই সব পয়গম্বরগণ তাদের জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে, তারা যাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের কাছে ধর্ম প্রচার করেছেন, এই সব নবী (আঃ) গণ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ও বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এই সব মহান আল্লাহর নবীগণ (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের চাপ, ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করে সহ্য ও মোকাবেলা করেছেন। তারা তাদের জনগোষ্ঠির কাছে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী তাদের চরিত্র গঠন ও সকল কাজ নির্বাহ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ সব থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, নবীগণ (আঃ) যে অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক সত্ত্বা হিসাবে ধর্ম প্রচার করেন নাই বরং রক্তমাংসের মানুষ বা ব্যক্তি হিসেবে একাজ সমাধা করেছেন। আলাহ্তালার এই অমোঘ বিধান শত শত বছর যাবত চালু আছে, যা সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে সমভাবে প্রযোজ্য।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব নবীদেরকে কেন্দ্র করে একদল ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ সকল নবী রসুলদের যুগেই ছিলেন বা থাকবেন। তাঁরা তাদের নবী রসুল (আঃ) শিক্ষা তাদের জীবনে হুবহু অনুসরন করে আসছেন। এই সব ঈমানদার লোক, যারা তাঁদের পয়গম্বরগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাদের শিক্ষা ও কর্মকান্ড ব্যক্তি জীবনে অনুসরন ও প্রতিপালন করেছেন। এই সব নবী/রসুল (আঃ) এর কর্মকান্ড চিন্তা চেতনাকে সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে অবিহিত করা হয়েছে।

এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন নবী রসুল (আঃ) দের ঘটনাবলীতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারীগণ একটি সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব এর প্রতিনিধিত্ব করতো। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব ছিল যখন নবী (সাঃ) স্বয়ং তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এই বিধান আখেরী জমানায় পরিবর্তিত হবে না। বদিউজ্জামান বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদী (আঃ) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে ঈমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দিবেন।

বদিউজ্জামান নুসরী, সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব শব্দগুচ্ছ কোরানের বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের ছাত্রদের সম্পর্কে ইংগিত করে এটিকে সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে ব্যবহার করে। তিনি নিজেই এই গ্রুপের প্রধান ছিলেন।

রিসালত আল নুর এর সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব বলতে তার অনুসারীরা ও তার লেখনীসমূহ মান্যকরীদেরও বোঝাত। নুর আন্দোলনের নেতাকে এ ধারা থেকে বাদ দেওয়ার বা আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নাই।

এটা সার্বিকভাবে জানতে ও বুঝতে হলে, এটা করতে হলে বিসালত আল বর্নিত, ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানতে পারি ঃ

১. একজন অসাধারন ব্যক্তি যিনি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। তিনি সেই হিংস্র দজ্জাল এর কার্যক্রম বন্ধ করতে সক্ষম। যিনি নিজেকে এ সব অলৌকিক কার্যক্রমের মধ্যেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। তিনি যেন কোন রকম বিভ্রান্তির শিকার হওয়া থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ যদি সম্মোহনী ক্ষমতা, আধ্যাত্মিক বা প্রেতদের ক্ষমতা যা দেখে সবই বিস্মিত হয়ে পড়বেন এবং তিনি হবেন সেই ব্যক্তি যিনি হবেন হযরত ঈসা (আঃ) যিনি বিশ্বের অধিকাংশ লোকের নেতা।

বদিউজ্জামান বর্ণনা করেছেন, কিভাবে দজ্জাল আখেরী জমানায় জাহির হবেন এবং সাধারন লোককে দজ্জাল বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। দজ্জালের এসব অপকর্ম হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয়বার আগমনের মাধ্যমে অপসারিত হবে, বদিউজ্জামান, আমাদের নবী (আঃ) এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, দজ্জাল অনেক ধরনের অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত কাজ করতে সক্ষম হবে।

এ ধরনের কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

দজ্জাল একজন বেদুইনকে বলবে, আমি তোমার প্রভু, একথা কি তুমি বিশ্বাস করবে? যদি আমি তোমার মৃত মাতাপিতাকে পুনরুত্থিত করে দেখাতে পারি? তখন বেদুইন বলবে, হ্যাঁ। এ প্রেক্ষিতে তার দুইটি অনুচর শয়তান তার পিতা মাতার আকৃতিতে হাজির হবে

(সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

সে একজন লোক ডাকবে, তার অনুচরদের বলবে একে করাত দিয়ে কেটে টুকরা তার নির্দেশে করে ফেল। সেই ব্যক্তির শরীর কেটে দু ভাগ করে ফেলা হবে। তখন যে উপস্থিত জনতাকে বলবে, আমি আমার এই দাসকে কেটে দু ভাগ করে ফেলেছি। এখন আমি আবার তাকে জীবিত করব

(সুনামে ইবনে মাজাহ)

এসব হাদীস অনুযায়ী দজ্জাল এ ধরনের মিথ্যা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে মানুষের প্রভু হিসাবে মেনে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাবে। অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোক, তার এই ক্ষমতাকে প্রকৃত অলৌকিক ক্ষমতা বিবেচনা করে তার আনুগত্য প্রকাশ করবে। প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক কার্যক্রমের ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে

তার পবিত্র বান্দাদের দেওয়া হয়ে থাকে। দজ্জালের এ সব অসাধারন ক্ষমতা কোন অলৌকিক ব্যাপার হবে না বরং তা হবে এক ধরনের শয়তানী শক্তি বা কালো যাদু বা (Black Magic), যা আলাহ্তালা অবিশ্বাসী দজ্জালকে ঈমানদারকে পরীক্ষা করার জন্য এ ক্ষমতা দান করবেন।

বদিউজ্জামান লিখেছেন, এভাবে দজ্জাল এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে বহু লোককে সে তার অনুসারী বা অনুগত বানাতে সক্ষম হবে। দজ্জালর এসব বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে থাকবে। এমন একসময়ে যখন সমস্ত খৃষ্টান জগৎ হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবে। ইহুদীরাও অনুরূপভাবে হযরত মসীহর (আঃ) জন্য অপেক্ষা করবে। এ কারনে দজ্জাল বহু লোক তার অপকৌশল ও (Black Magic) এর ক্ষমতা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। বদিউজ্জামান দজ্জালের এই অপক্ষমতাকে তার ব্যক্তিগত ও একক ক্ষমতা হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন এটি কোন সম্মিলিত বা যৌথ ব্যক্তিত্ব নয়। বদিউজ্জামান বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, দজ্জাল সম্মোহনী শক্তি ও (Hypnosis) অন্যান্য (Black Magic) এর ক্ষমতা প্রদর্শন করে লোকদের সাথে ধর্মীয় প্রবঞ্চনা (Religious Deception) করবে।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, দজ্জাল একজন ব্যক্তি, হযরত ঈসা (আঃ) ও একজন ব্যক্তি, ও হযরত ইমাম, মাহদী (আঃ) ও একজন ব্যক্তি। এখানে কোন রূপক বা যৌথ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। বিষয়টি রিসালাত আল নুর পুস্তকে বর্ণিত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার আগমনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন অসাধারন ব্যক্তিই পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের পয়গম্বর হতে পারেনঃ

বদিউজ্জামান বলেন, দজ্জালের এই ভয়াবহ ফিতনা বা বিপর্যয় থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, এমন একজন মহান ব্যক্তি যিনি বিশেষভাবে আর্শীবাদপ্রাপ্ত যিনি আল্লাহর অনুগ্রহে অলৌকিক কার্যাবলী ঘটাতে পারদর্শী হবেন, এবং যাকে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ অনুসরন, মান্য ও সর্বোপরি শ্রদ্ধা করবে ও ভালবাসবে। এই ব্যক্তি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ নয় এ ব্যাপারে কোন ধরনের সন্দেহই কারো মধ্যে থাকার অবকাশ নাই।

বদিউজ্জামান ঐখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হযরত ঈসা কে (আঃ) ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তাই "যৌথ ব্যক্তিত্ব" সম্পর্কে বদিউজ্জামানের লেখনীর ব্যাপারে যে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রচার করা হয় তা অমূলক ও ভিত্তিহীন।

তাছাড়া একজন অসাধারন ও অলৌকিক ক্ষমতা ব্যক্তি এবং মানবজাতির অধিকাংশ জনগণের পয়গম্বর এমন ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করে বদিউজ্জামান হযরত ঈসাকেই (আঃ) এই কৃতিত্ত্বের অধিকারী হিসাবে সঠিকভাবেই বিবেচনা করেছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বদিউজ্জামান অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) একজন ব্যক্তি হিসাবে অদ্ভুত, অসাধারন ও অলৌকিক কর্মকান্ড সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া হযরত ঈসাকে (আঃ) ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীর অধিকাংশ জনগণ মান্য ও বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা ও ভালবাসে।

বদিউজ্জামান, তার উন্নত জ্ঞানে অত্যন্ত সঠিক ভাবেই জানতেন কোন যৌথ ব্যক্তিত্বের পক্ষে অলৌকিক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব না। তিনি আরো অবগত ছিলেন কোন যৌথ ব্যক্তিত্বকে পয়গম্বর হিসাবে পৃথিবীর অধিকাংশ জনতা বিশ্বাস করেনা।

হযরত ঈসা (আঃ) এর এসব বিবরণ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে বদিউজ্জামান অত্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্ববাসী বিশেষ করে মুসলিম জনগণকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি হিসাবেই প্রত্যাবর্তন করবেন।

সেই ব্যক্তি হবেন হযরত ঈসা (আঃ) ঃ

বদিউজ্জামান বর্ণনা করেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) দজ্জালের ফিতনা (দুঃখ-কষ্ট বিপর্যয়) নির্মুল করবেন। অন্যকথায় মানবজাতিকে উদ্ধার করবেন । এ কারনে তাকে ত্রাণকর্তা বলা হয়। বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন, হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আলাহ্র দুশমন হযরত ঈসা (আঃ) কে তখন লবন দেখবে পানিতে যেমনিভাবে লবন গলে সে (দজ্জাল) তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং যদি তিনি (হযরত ঈসা (আঃ) তাকে দজ্জালকে আক্রমন নাও করতেন সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হতো। কিন্তু আলাহ হযরত ঈসার (আঃ) হাতে দজ্জালের ধ্বংস নির্ধারিত করেছেন (সহীহ মুসলিম)। দজ্জাল যখন বিশ্বে ফিতনা সৃষ্টি করতে থাকবে, আলাহ্ মসীহ্ হযরত ঈসা (আঃ) মরিয়ম (আঃ) তনয়কে দুনিয়ায় প্রেরণ করবেন। সকল খোদাদ্রোহী বা অবিশ্বাসী যে হযরত ঈসা (আঃ) এর গায়ের খুশবু শুকবে, সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর তার গায়ের খুশবু ততদূরই যাবে যতদূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পারবেন। তখন হযরত ঈসা

(আঃ) দজ্জালের খোঁজ করতে থাকবেন। অতঃপর তিনি দজ্জালকে লুদ (Ludd) এর ফটকে ধরে ফেলবেন এবং তাকে ধ্বংস করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) দজ্জালকে তাড়া করবেন এবং লুদ এর বায়তুল মোকাদ্দাস এর নিকট গেইট তাকে ধরে ফেলবেন এবং একটি আয়কর তাকে ধ্বংস করবেন (সহীহ মুসলিম)। "সেই ব্যক্তি" কথাগুলি ব্যবহার করে বদিউজ্জামান বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন ব্যক্তি বদিউজ্জামান হতে হবে একথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) এর বিষয়ে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সবসময় এক বচন ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি হযরত ঈসা (আঃ) একক ব্যক্তি বা সত্তা হিসাবে বর্ণনা করে তিনি হযরত ঈসা কে (আঃ) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে একজন অসাধারন আর্শীবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে নিশ্চিত করেছেন।

২। হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তন:

তিনিই যে আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) এটা শুধু ঈমানের আলোতেই জানা যাবে। সকলে বিষয় জানতে বা বুঝতে পারবে না। অনুরূপভাবে ভংয়কর ও হিংস্র দজ্জাল ও সুফীয়ানী গোষ্ঠীও হয়ত তারা হয়ত নিজেরাও জানবে না যে, তারা আসলে তাই (আলাহ্ সর্বজ্ঞ)।

বদিউজ্জামান বলেছেন, আখেরী জামানায় হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু সবাই এই আর্শীবাদপুষ্ট মহান ব্যক্তিকে চিনতে সক্ষম হবে না।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ধরায় অবতরন ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) এর এই পৃথিবীতে অবতরন প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান বর্ণনা করেছেন, কিভাবে হযরত ঈসা (আঃ) মানবীয় আকৃতিতে, আখেরী জমানায়, দুনিয়ায় আল্লাহর কুদরত হিসাবে অবতরন বা প্রত্যাবর্তন করবেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে বদিউজ্জামান অতি সুস্পষ্টভাবে ঈসা (আঃ)কে একজন ব্যক্তি হিসাবে কোন যৌথ ব্যক্তিত্ব হিসাবে নয়, খৃষ্টান জনগোষ্ঠিকে নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

তিনি স্বয়ং ঈসা (আঃ) :

এ প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান বলেন, যখন হযরত ঈসা (আঃ) প্রথম দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি প্রথম অবস্থান বুঝতে পারবেন না যে, তিনিই পয়গম্বর ঈসা (আঃ)। তিনি পরর্তীতে তা অনুধাবন করবেন এ ব্যাপারে যৌথ ব্যক্তিত্ব এর কোন মতবাদের অস্তিত্বের প্রশ্নই আসেনা।

হযরত ঈসাকে (আঃ) ঈমানের আলোকে চেনা যাবে, সবাই তা বুঝতে সক্ষম হবে নাঃ

বদিউজ্জামান বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছের লোকরা তাদের ঈমানের আলোয় তাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত পয়গম্বরকে চিনতে সক্ষম হবে। এটা আবারও প্রমান করে যে, বদিউজ্জামান হযরত ঈসাকে (আঃ) কোন যৌথ ব্যক্তিত্ব হিসাবে উল্লেখ করছেন না। বদিউজ্জামান বলেছেন, সেই বহু প্রতীক্ষিত ব্যক্তি, এটি কোন যৌথ ব্যক্তিত্ব নয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যক্তি তাকে চিনতে সক্ষম হবে না।

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি হযরত ঈসাকে (আঃ) চিনতে সক্ষম হবে না। বদিউজ্জামান বলেন, যখন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করবেন, প্রকৃত ঈমানদারগণ তাঁকে দেখামাত্র তাদের ঈমানের আলোয় চিনতে সক্ষম হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে যাবে।

ভয়ংকর চরিত্রের দজ্জাল ও সুফিয়ানী গোষ্ঠি যে মানবতার দুশমন তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে জানবে না:

বদিউজ্জামান উল্লেখ করেন, আখেরী জামানায় অভিশপ্ত দজ্জাল, সুফীয়ানী বংশের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের চরিত্র, যারা হযরত ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা কে (আঃ) অস্বীকার করতঃ তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামে লিপ্ত হবে। তাদের কেউ সকলে চিনতে পারবে না। বদিউজ্জামান দজ্জাল ও সুফিয়ান গ্রুপ হিসাবে ভয়াবহ চরিত্র হিসাবে ব্যক্তি সত্তা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

বদিউজ্জামান তার গ্রন্থে হযরত মাহ্দী (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) কে "ব্যক্তি" "ব্যক্তিত্ব" "জনৈক" ইত্যদি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। দজ্জাল ও সুফিয়ানী বংশধরগণ ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইমাম মাহদী যৌথ ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। বদিউজ্জামান বর্ণনা করেছেন, যেমন মসীহ দজ্জাল, সুফিয়ানী বংশধর ব্যক্তি হিসাবে আগমন করবে, একারণেই হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইমাম মাহ্দী (আঃ) যারা এদের ফিতনা নির্মূল করবেন তারাও আল্লাহর ইচ্ছায় আর্শীবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে আখেরী জামানায় উপস্থিত হবেন।

৩। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবেন:

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর ইমামতিতে ফরজ নামাজসমূহ আদায় করবেন ও তাকে অনুসরন করবেন। এই মিলন পরোক্ষভাবে কোরআনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ইংগিত বহন করে। আমাদের নবী (সাঃ) উল্লেখ করেছেন, কিভাবে হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ইমামতিতে নামাজ আদায় করবেন।

হযরত মাহ্দী (আঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দসে তাঁর সাথীদের সাথে নামাজ আদায় করতে থাকবেন। এমন সময় হযরত ঈসা (আঃ) যিনি ইতোমধ্যে ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর সাথে পরিচিতি হবেন। হযরত ঈসা (আঃ) ইমাম মাহ্দীর (আঃ) কাঁধে হাত দিয়ে বলবেন, "নামাজ আদায় করার জন্য আপনি নির্দেশিত, আপনি অবশ্যই ইমামতি করবেন।" (আল কওল আল মুখ্তাদাসর ফি আলামত আল মাহ্দী আল মুনতাজার, পৃ– ২৫)

বদিউজ্জামান এই হাদীসটি উদ্বৃত করে, ঘটনাটি হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) দুনিয়াতে আগমনের বড় ধরনের একটি নির্দশন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধ হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মাহ্দী (সাঃ) এর সময়ে সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী হবে। তাদের এই মহাবুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম যৌথভাবে বিশ্ব পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে পুনর্বার আগমন করবেন। তিনি ফরজ নামাজ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর পিছনে আদায় করবেন এবং তাকে অনুসরন করবেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় যখন হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করবেন, তিনি প্রথম আগমনের সময় যেমন নামাজ আদায় করতেন তেমনি তার দ্বিতীয় আগমনের পরেই সেই রকম নামাজ আদায় করতে থাকবেন। কোরানে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

তিনি হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন। তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাক ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে।"

(সুরা মরিয়ম ৩০-৩১)

হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মাহ্দী (আঃ) আখেরী জামানায় বিশেষ আশীবাদপূষ্ট ব্যক্তি হিসাবে আগমন করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর পিছনে নামাজ আদায় করবেন এবং ইসলাম ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করবে।

বদিউজ্জামান বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এটি একটি বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস। তারা পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করবেন। এ কারনে এ দুই মহান ব্যক্তিত্বের একই সময়ে একসাথে অবস্থান অত্যন্ত জরুরী। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পিছনে তার নামাজ আদায় প্রত্যক্ষ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

৪ । ইহাও একটি পরোক্ষ ও নির্দশন যেঃ

আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী আধ্যাত্মিক জনগোষ্ঠী হযরত ইমানের আলোয় হযরত ঈসা (আঃ) চিনতে পারবে তারা দজ্জালের অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যাপক সংখ্যক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ও ছোট হবে। এটিও একটি পরোক্ষ নিদর্শন।

হযরত ঈসা (আঃ) অনুসরন ও সমর্থনকারী :

হযরত ঈসা (আঃ) এর সময়ে উপস্থিত থেকে এই আশীর্বাদপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিত্বের সাথে থেকে তাঁর সহায়তা করা, বা তাঁর অনুসারী হওয়া মুসলমানদের জন্য একটি অতি গৌরবজনক প্রত্যাশা। হাদীসের বর্ণনা ও বদিউজ্জামানের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, আল্লাহতালা হযরত ইমাম মাহদীকে (আঃ) এবং তার সহচারবৃন্দ যারা আল্লাহর পথে বুদ্ধিবৃত্তিক জেহাদে বা সংগ্রামে অংশ গ্রহন করবেন তাদেরকে সেই মর্যাদা দান করবেন যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এর যে, অল্পসংখ্যক অনুসারীকে দিয়েছিলেন।

বদিউজ্জামান বলেন, সত্যের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম তাছর নিজের সময়ের পরে শুরু হবে। তাই হযরত ঈসা(আঃ) ও হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) বদিউজ্জামানের সময়ে আগমন করেন নাই।

আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী আধ্যাত্মিক গ্রুপ ঃ

এই অধ্যায়ে বদিউজ্জামান এক গ্রুপের কথা উল্লেখ করেছেন যারা হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সমর্থন করবে যে, পথে তিনি তাদেরকে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রশংসনীয়, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা হওয়াই আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যাতে সে তাঁকে যথাযথ অনুসরন করতে পারে। এই অধ্যাত্মিক গ্রুপ, যারা আল্লাহর পথে হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথী হবে তারা অতি উচ্চ মর্যাদার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হবেন, যারা আল্লাহর পথে সার্বক্ষনিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবেন।

তারা একটি ক্ষুদ্র দল, সংখ্যায় অল্প ঃ

বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) যে দলের নেতৃত্ব দিবেন তারা সংখ্যায় আল্লাহ বিরোধীদের তুলনায় খুব কম হবে। আল্লাহতালা কোরানে উল্লেখ করেছেন যে:

কত ক্ষুদ্র একটি দল আল্লাহর হুকুমে অনেক বড় একটি দলের উপর বিজয় লাভ করল।

(সুরা বাকারা– ২৪৯)

হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মাহদী (আঃ) এর প্রকৃত ঈমানদার অনুসারীগণ যদিও সংখ্যায় কম হবে তবুও আখেরী জমানায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় লাভ করবেন এবং বিশ্বব্যাপী দজ্জালের ফিতনাহ সমূলে ধ্বংস করবে।

৫। হাদীসে বর্ণিত আছে যে দজ্জাল এত বেশী শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু হবে যে, শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। অন্য কেহ বা কিছু তা করতে পারবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র ঐশী, মর্যাদাপূর্ণ, বিশুদ্ধ ধর্মই দজ্জালের মত পথ ও তার প্রবল লুণ্ঠনকারী, লোভী, ক্ষমতাশালী শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর সত্য অনুসারীদের মধ্য হতেই এই ধরনের ধর্মের সৃষ্টি হবে যারা পবিত্র কোরানের অনুসরনকারী হয়ে এর সাথে সম্মিলিত হবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর দজ্জালের অবৈধ ও ধর্মহীন দখল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ও বন্ধ হবে। এই প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান একটি হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) এর মাধ্যমেই দজ্জালের ফিতনা দুনিয়া থেকে অপসারিত হবে।

তিনি বলেন, জনগণ দজ্জালের খোদাদ্রোহী আক্রমনাত্মক ক্ষমতালোভী শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করবে। দজ্জালের মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি ধর্মোদ্রোহিতা প্রচলন পবিত্র বিষয়কে অপবিত্র ও ধ্বংস করতে বদ্ধ পরিকর এই ধারা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত ও স্বাধীন করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রকৃত খৃষ্টান অনুসারীরা তাঁকে অনুসরন করবে। তার দ্বিতীয়বার আগমনের পর তিনি দজ্জালের ধর্মহীন মিশন ও কার্যক্রম চিরতরে খতম করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ)ই দজ্জালকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব:

নবী (আঃ) এর একটি হাদীসের বরাত দিয়ে বদিউজ্জামান বলেছেন, শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও সকল প্রকার কর্মকান্ডে দজ্জাল নিরস্ত্র বা ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীকে দজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্ত রক্ষা ও উদ্ধার করবেন।

বদিউজ্জামান দজ্জালকে সে বা তিনি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, বদিউজ্জামান তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করেছেন। বদিউজ্জামানের মতে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) দজ্জালের খোদাদ্রোহিতার প্রচার প্রসাবের সমাপ্তি ঘটাবেন। বদিউজ্জামান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) একমাত্র ব্যক্তি যিনি দজ্জালকে নিরস্ত্র ও ধ্বংস করতে সক্ষম। আর এভাবে তিনি ঈমানদারদের সুসংবাদ দিয়েছেন যে, ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের পর পৃথিবীতে শান্তি ও সৃমদ্ধি বিরাজ করবে।

দজ্জালের ক্ষমতালোভী শাসন ব্যবস্থা বা রাজত্ব বিপর্যস্ত ও ধ্বংস হবে:

বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন, দজ্জালের ফিতনা সমগ্র বিশ্বব্যপী অশান্তি, মারামারি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ, নীতিহীনতা ও দুর্নীতি ঘটতে থাকবে। এই ফিতনা সম্পূর্ণভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এর মাধ্যমেই অপসারিত হবে।

বদিউজ্জামান বলেন, দজ্জালের মিশন হলো ধর্মোদ্রোহিতার প্রচার ও প্রসার ও ধর্মহীনতার মাধ্যমে সকল প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি। বদিউজ্জামান বিশ্ববাসীকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করে দজ্জাল সৃষ্ট সকল

প্রকার শয়তানী ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা লোভীদের রাজত্ব ধ্বংস করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) বিশ্বব্যাপী ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা পূর্বক পৃথিবী শাসন ও পরিচালনা করবেন।

এখানে বদিউজ্জামান বিষয়টি পূনর্ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) শারীরিকভাবে মানবীয় সত্তা হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করবেন। বদিউজ্জামান দজ্জাল সম্পর্কে বলেন যে, দজ্জাল একজন মানবীয় সত্তা এবং দজ্জালের সকল প্রকার অপকর্ম ও জুলুম নির্যাতন ও ব্যক্তি সত্তা হযরত ঈসা (আঃ) নির্মূল করতে সক্ষম হবেন।

একটি উন্নত ঐশী পরিশুদ্ধ ধর্ম হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবে। যারা কোরানের সত্যের সাথে মিলিত হয়ে এক যোগে কাজ করবে।

ঈসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধিবিধান:

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত পয়গম্বর। তিনি জনগণকে একমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং আল্লাহর নির্দেশিত ধর্মীয় নৈতিকতা অনুযায়ী জীবন পথে চলার জন্য আহ্বান জানাতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁকে তুলে নেয়ার পর খৃষ্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাস বিকৃত হয়ে যায় এবং খৃষ্টানগণ আল্লাহর উপর বিশ্বাস থেকে বহু দূরে চলে যায়। ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের পর তিনি খৃষ্টান ধর্মমতকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। যে সমস্ত বিকৃতি ও বিভ্রান্তি খৃষ্টধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে তা থেকে ধর্মকে মুক্ত করে এই মহান ধর্মকে তার পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। বদিউজ্জামান এই বাস্তব

পরিস্থিতি এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মধ্য হতে সঠিক, পরিশুদ্ধ ধর্ম আত্মপ্রকাশ করবে।

বদিউজ্জামান বর্ণনা করেছেন, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এক হয়ে যাবে এবং তারা সবাই কোরানের অনুসারী হবে। তিনি আমাদের স্মরন করিয়ে দিয়েছেন, এসব ঘটনাবলীর প্রকাশ বিকাশ ও সংঘটিত হওয়া হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের নিদর্শন বা আলামত। বদিউজ্জামান বর্ণিত ঘটনাবলী এখনও সংঘটিত হয় নাই। বদিউজ্জামান হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইমাম মাহ্দী (আঃ) যারা সমসাময়িক হবেন অথবা বদিউজ্জামানের জীবিত থাকাকালীন সময় পর্যন্ত উপার্জন করবে। হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরনের পর দজ্জালের ধর্মহীন কর্মকান্ড ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরান ও হাদীসে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করবেন। বদিউজ্জামান এ ক্ষেত্রে “অবতরন” বা “নীচে” নামিয়া আসার কথা বলতে হযরত ঈসাকে (আঃ) একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আঃ) এই পৃথিবীতে মানবীয় আকৃতিতে ধরায় অবতরন করবেন। একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বা ব্যক্তি হিসাবে কোন যৌথ ব্যক্তিত্ব হিসাবে নয়।

বদিউজ্জামানের ভাষ্য অনুযায়ী দজ্জালের খোদাদ্রোহিতামূলক সকল কর্মকান্ড হযরত ঈসা (আঃ) এর মানবীয় আকৃতির একজন ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীতে আগমনের পর শেষ হয়ে যাবে।

৬। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর বেহেশত থেকে দুনিয়াতে আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত সত্য। তাছাড়া অন্যান্য তথ্যাদি এ ধরনের ইংগিত বহন করে। এটা একটি আলাহ্‌র অলৌকিক ঘটনা বা কুদরতও বটে। বদিউজ্জামান বলেন, এই পৃথিবীতে আখেরী জামানায় হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন একটি স্থির নিশ্চিত বিষয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এর বেহেশত থেকে অবতরন একটি স্থির নিশ্চিত বিষয়ঃ

আখেরী জমানায় হযরত ঈসা (আঃ) এর এই দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার আগমন এমন একটি বাস্তব সত্য যা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। বদিউজ্জামান আরো বলেন, এই বিষয়টি নির্ভরযোগ্য হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উলিখিত আছে। এগুলো সত্যিকার ঈমানদারদের জন্য অত্যন্ত শুভ সংবাদ। আল্লাহর ইচ্ছায়, যে সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তি আখেরী জামানায় বেঁচে থাকবেন তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর ২০০০ বছর পর এই পৃথিবীতে আগমনের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবেন।

বদিউজ্জামান এ ক্ষেত্রে “নিশ্চিত” শব্দটি ব্যবহার করে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার ধরায় এই আগমনের বিষয়টি স্থির নিশ্চিত। বদিউজ্জামান যে হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা বলার দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, সেই হাদীসের শর্তানুযায়ী এ ব্যাপারে কোন ভিন্নমত প্রকাশের অবকাশ নাই।

৭। খৃষ্টবাদের “সম্বিলিত ব্যক্তিত্ব” হিসাবে হযরত ঈসা (আঃ) অধর্ম ও খোদাদ্রোহিতার মূর্তিমান প্রতীক হিসাবে দজ্জালকে তথা “সম্মিলিত ব্যক্তি” কে ধ্বংস করবেন।

এই অনুচ্ছেদে বদিউজ্জামান বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে দজ্জালের ফিতনা নির্মূল তথা ধ্বংস করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) খৃষ্টধর্মের "সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব" এর প্রতিনিধি:

হযরত ঈসা (আঃ) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে "সম্মিলিত ব্যক্তিত্বকে" নেতৃত্ব ও তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবেন। বদিউজ্জামান বর্ণিত এই বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণের জন্য একটি বা দুটি প্রশ্নের সার্বিক উত্তর পযালোচনা করতে পারিঃ

১. একজন ব্যক্তি যিনি খৃষ্টধর্মের "সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের" প্রতিনিধি। কোন সেই জন? হযরত ঈসা (আঃ)।

২. হযরত ঈসা (আঃ) কোন "সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের" প্রতিনিধি খৃষ্ট ধর্মের সম্বলিত ব্যক্তিত্ব।

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে দেখা যায় যে, বদিউজ্জামান, হযরত ঈসা (আঃ) এবং তার সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব দুই মতবাদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

দজ্জাল ধর্মহীনদের তথা ধর্মদ্রোহী সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি:

বদিউজ্জামান বলেন, দজ্জাল ব্যক্তিগতভাবে ধর্মাদ্রোহীদের "সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব"। বদিউজ্জামান তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন হাদীসের প্রাপ্ত তথ্য প্রমানের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আখেরী জমানায় যে সব ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে দজ্জালের নামও উল্লেখ আছে। বদিউজ্জামান হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছেন, এরা সবাই ব্যক্তি হিসাবে আখেরী জমানায় উপস্থিত থাকবেন। এই বিষয়টিই বদিউজ্জামান নিশ্চিত করেছেন।

৮। যদিও ধর্মহীনতার যুগে খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম যুক্তভাবে ধর্মদ্রোহীতাকে ধ্বংস ও হীন বলে করতে সক্ষম হবে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত ঈসা (আঃ), যিনি সশরীরে বেহেশতে অবস্থান করছেন, তিনি এই পৃথিবীতে আগমনপূর্বক ধর্মের মূল ধারাকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এটি সেই সর্বশক্তিমানের মহাসত্য সংবাদদাতার বানী। তাই ইহা অবশ্যই সত্য। এই ঘটনাবলী ঘটার অঙ্গীকার সেই মহান সত্ত্বার যিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান তাঁর। আর তিনি অবশ্যই এটি বাস্তবায়ন করবেন।

বদিউজ্জামান বলেন, খৃষ্টানরা যখন কোরআনের দিকে ধাবিত হয়ে ইসলামের অনুসারী হয়ে যাবে, এই মহান দুই ধর্মের একত্রিকরনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে পৃথিবীতে ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তিশালী হবে। তারা সকল ধরনের নাস্তি

ক্যবাদ, ধর্মদ্রোহিতার ইত্যাদি মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এমন সময়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ঈমানদের নেতৃত্ব দেবেন। বদিউজ্জামান উল্লেখ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আলাহ্‌তালা প্রদত্ত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং স্মরন করিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ অত্যন্ত তৎপর।

তিনি বেহেশতে সশরীরে অবস্থান করছেনঃ

এই অনুচ্ছেদে বদিউজ্জামান বলেছেন, অতি শীঘ্রই খৃষ্ট ধর্ম বিদ্যমান ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মূলধর্মীয় অনুষ্ঠানিকতার সাথে অসংগতিপূর্ণ কর্মকান্ড থেকে মুক্ত হয়ে মূলধারায় ফিরে আসবে এবং পবিত্র কোরআনের অনুসারী হবে। যে সমস্ত খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ইসলামে দাখিল হবে এবং মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খোদাদ্রহীতার সকল মতবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যক্তি সত্ত্বা ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী জমানায় একজন আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি হিসাবে দ্বিতীয়বার আগমনপূর্বক হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে একযোগে কাজ করবেন এবং দজ্জালের ফিতনা নির্মূল করবেন। হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) একত্রে ইসলাম ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী বিশ্বরাষ্ট্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন

করবেন। আখেরী জমানার এই মহাসুসংবাদ অদাবধি বাস্তবায়িত হয় নাই। মুসলিম বিশ্ব এসব ঘটনাবলী ঘটার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। এটি একটি সন্দেহাতীত ব্যাপার যে, এত বড় ঘটনা বিশ্ববাসীর কাছে অবশ্যই দৃশ্যমান হবে। বিশেষ করে বর্তমান শক্তিশালী মিডিয়ার কল্যাণ সবাই তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

হযরত ঈসা (আঃ) মূল ধারায় নেতৃত্ব দিবেন:

বদিউজ্জামানের ভাষায়, তিনি সঠিক ধর্মের মূলধারায় নেতৃত্ব প্রদান করবেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর দুনিয়ায় আগমনের পর তিনি প্রকৃত খৃষ্টানদের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর দুনিয়ায় আসার পর খৃষ্টধর্ম সকল প্রকার বিভ্রান্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য ধর্মাদ্রোহী কার্যকলাপ ও আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত হয়ে কোরআন অনুসরন করবে।

বদিউজ্জামান হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সব বিবরণ ও ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের সংগে একসূত্রে গাঁথা।

যাহোক, এখন পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আগমন ঘটে নাই অথবা তিনি খৃষ্টানদের নেতৃত্ব গ্রহণও করেন নাই। আবার খৃষ্টানরা তাদের বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় মতাদর্শ ও কুসংস্কার থেকে ও মুক্ত হয় নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে ইমাম মাহদী (আঃ) এক যোগে কাজ করার ব্যাপারটি এখনও সংঘটিত হয় নাই। তাই বদিউজ্জামান কর্তৃক প্রদত্ত ও বর্ণিত তথ্যাদি স্পষ্টতঃ ঘোষনা করে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন ইতোপূর্বে সংঘটিত হয় নাই। এইসব ভবিষ্যৎ অনুযায়ী উল্লেখিত ঘটনাবলী তাঁর আগমনের সুস্পষ্ট প্রমান ও সুসংবাদ।

সর্বশক্তিমানের ওয়াদা যিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর কর্তৃত্বশালী ও ক্ষমতাবান:

বদিউজ্জামান এর মতে এসব অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি হলো সর্বশক্তিমান আলাহ্‌র ওয়াদা। কোরআনে আল্লাহতালা, ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালিত হবে মর্মে ঘোষণা করেছেন বিধায় এটি একটি প্রামান্য সত্য।

আল্লাহ্‌র এই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে ঃ

তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন, তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাহাদের দ্বীন যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে আমার কোন শরীক করিবে না। অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা সত্যত্যাগী।

(সুরা নূর– ৫৫)

আলাহ্তালা অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পালন করেন তা কোরআনে উল্লেখ আছেঃ

ইহা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না

(সুরা আল ইমরান– ৯)

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতিই, আলাহ্তালা খেলাফ করেন না

(সুরা রা'দ–৯)।

নিশ্চয়ই আলাহ্তালা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না

(সুরা রা'দ– ৩১)।

আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে যে সকল ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই প্রতিপালন করবেন। বদিউজ্জামান বিষয়টি আমাদের স্মরন করিয়ে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আখেরী জমানায় এসব ঘটনাবলী অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৯। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রশংসা যার, তাঁর জ্ঞান থেকে কোন কিছু দূরেও নয়, সেই মহান আলাহ্তালা সব সময় বেহেশত থেকে পৃথিবীতে ফেরেশতা প্রেরণ করেন, কখন কখনও মানবীয় প্রতিকৃতিতে যেমন জিব্রাইল (আঃ) হযরত দেখিয়া কলবীর (রাঃ) চেহারায়, আবার কখনও আত্মার সত্তায়, তাদেরকে আত্মার জগত থেকে প্রেরণ করেন, যারা দুনিয়ায় এসে মানবীয় আকার ধারন করেন। একইভাবে অনেক মৃত আল্লাহর ওলীগণ

পৃথিবীতে সশরীরে আগমন করে থাকেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর আত্মাকে তাঁর দৈহিক আবরনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ পূর্বক হযরত ঈসা (আঃ) এর ধর্মকে একটি সুন্দর পরিনতিতে নিয়ে এসে এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল তৈরী করা কোন কঠিন কাজ নয়। এমনকি তিনি যদি বেহেশতে জীবিত না থেকেও থাকতেন। এবং যদি তিনি সত্যিকারভাবে মৃতই হতেন এবং আত্মিক জগতের সর্বশেষ সীমায় অবস্থান করতেন তবুও আল্লাহতালা তার ওয়াদা রক্ষার জন্য তাই করতেন যা তার জ্ঞান অনুযায়ী করার বিষয়টি বিবেচনা করতেন। যেহেতু এটা আল্লাহর ওয়াদা, তাই তিনি অতি অবশ্যই তা পালন করবেন। অর্থাৎ তিনি অবশ্যই হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। বদিউজ্জামান হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি একটি নিশ্চিত সত্য এবং ফেরেশতাদের আগমনের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক বিষয়টি অধিক আলোজ্জল ও বাস্তবধর্মী হিসাবে বিবেচিত।

আল্লাহতালা সবসময় বেহেশত থেকে পৃথিবীতে ফেরেশতা প্রেরণ করেন:

আখেরী জমানায় হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি হলো আলাহর কুদরতের মধ্যে একটি। বদিউজ্জামান বলেন, এটি একটি বাস্তব সত্য যা পবিত্র কোরআনে ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে। বদিউজ্জামান বলেন, ফেরেশতারাও আলাহর ইচ্ছায় পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন। হযরত ঈসাও (আঃ) পৃথিবীতে আলাহর নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আগমন করবেন। তিনি আলাহর পয়গম্বর হিসাবে

লোকজনকে সত্য সঠিক ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য বলবেন।

ফেরেশতারা সময় ও স্থানের বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে থাকেন

ফেরেশতাগণ, যে মাত্রায় বা ধারায় বসবাস করেন তা মানবীয় চিন্তা চেতনা বা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ঃ

ইহা আসিবে আল্লাহর নিকট হইতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, ফিরিশতা ও রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধগামী হয় এমন এক দিনে, যাহার পরিমান পার্থিব হিসাবে ৫০ হাজার বৎসর।

(সুরা মাআরিজ ৩–৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এক দিনের সময় সীমা পার্থিব হিসাবে ৫০ হাজার বৎসর। এর অর্থ হলো ফেরেশতার আমরা যে সময়ের মাত্রায় বসবাস করি, ফেরেশতারা তার উর্ধে। এ বিষয়টি আরো প্রমান করে যে, মানবজাতির বিবেচনায় বা ধারনায় যে সময় ও স্থান রয়েছে, এ ছাড়াও অন্য একটি মাধ্যম (Dimension) ও অদৃশ্য জগত রয়েছে যা মানবীয় বুদ্ধির অগোচর বা উর্ধে। এটা অবশ্যই সম্ভব যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ এ ধরনের কোন মাত্রায় জীবিত অবস্থায় বাস করছেন (আলাহ্ সর্বজ্ঞ)।

প্রকৃতপক্ষে, আলাহ্র নির্দেশেই নির্ধারিত সময়ে ফেরেশতারা দুনিয়ায় আগমন করেন। তাই আলাহ্র নির্দেশে এটা সম্ভব যে, আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জীবন ধারা থেকে কাউকে অন্য ধারায় বা “ডায়মেনশনের” জীবনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, ফেরেশতারা কখন কখনও আল্লাহর ঐশী বাণী নাযিল করেন। আবার অনেক সময় ঈমানদারদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন:

যখন তুমি বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশতা প্রেরণ পূর্বক দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন।

(সুরা আল ইমরান– ১২৪)

তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ও ওহীসহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন এই বলিয়া যে, তোমরা সতর্ক কর যে, নিশ্চয়ই আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমাকে ভয় কর

(সুরা নাহল– ২)

কোরানে এও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ, সংবাদবাহক হিসাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত (আঃ) এর নিকট আগমন করে, তারা যে জনগণকে শাস্তি প্রদান করবেন তা বলেছিলেন, ফেরেশতাগণ হযরত জাকারিয়া (আঃ) এর নিকট হাজির হয়ে তাকে হযরত ইয়াহিয়ার (আঃ) এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ হযরত মরিয়ম (আঃ) এর নিকট এসে তিনি যে আলাহর নির্বাচিত মহিলা এবং তাঁকে হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের সুসংবাদ দান করেন। আমরা জানি ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে কোরানের বানী নিয়ে আসেন। এবং রাসুল (সঃ) জিব্রাইলকে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

বদিউজ্জামান, ফেরেশতাদের বিষয়ে উল্লেখ করে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন,যে, আখেরী জামানায় হযরত ঈসা (আঃ) এর মানবীয় আকৃতিতে আগমন, আল্লাহর আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই আলাহ্ অবশ্যই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর ধর্মকে একটি শুভ পরিনতিতে নিয়ে আসা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ঃ

বদিউজ্জামান এর মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে তাঁর ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শুভ পরিনতি ঘটবে। হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীকে আগমন খৃষ্টধর্মকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অধর্মীয় তথা বিধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করবেন। ফলে খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এক ধর্মে পর্যবসিত হবে। এভাবে খৃষ্ট ধর্ম হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত সঠিক ধর্মমতে ফিরে আসবে। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ সম্মিলিত ভাবে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কাজ করে বিশ্বকে প্রকৃত শান্তি উপহার দিতে সক্ষম হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে জীবিত অবস্থায় বেহেশতে অবস্থান করছেন:

বদিউজ্জামান বলেছেন যে, ফেরেশতাদের মতই হযরত ঈসা (আঃ) জীবিতভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থান করছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত সময়ে পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন।

ফেরেশতাগণ, আল্লাহর নির্দেশে একাধিকবার পৃথিবীতে অবতরন করেন আবার পুনরায় আল্লাহর সান্নিধ্যে উর্ধে গমন করেন। তাই আল্লাহর সান্নিধ্যে উর্ধে গমন বলতে আমরা পার্থিব বুদ্ধি অনুযায়ী যেমন অদৃশ্য বুঝি প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং এটি এক জগত থেকে অন্য ধরনের জগতে বা পর্যায়ে গমন ও সেখানে অবস্থান করাকে বোঝায় যদিও আমরা মানবীয় বুদ্ধিতে বিষয়টি আমরা বুঝতে বা ধারনা করতে সক্ষম নই।

হযরত ঈসা কে (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার অর্থই তাঁর মৃত্যু নয়। এ ব্যাপারে কোরানে বহু আয়াতে অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই এবং তাকে হত্যাও করা হয় নাই বরং তিনি জীবিত রয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এমন এক জগতে জীবিত রয়েছেন যা আমাদের সাধারন মানবীয় বোধগম্যতার বাইরে। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ উভয় জগতে আল্লাহর নির্দেশে অত্যন্ত সাবলীলভাবে চলাফেরা করে থাকেন যা আল্লাহর নির্দেশে একটি সহজ ব্যাপার।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেই সময় যখন আসবে, তখন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করে, আলাহর নবী হিসাবে তিনি প্রথমবার আগমনের সময় যে ধর্মপ্রচার করতেন, সেই ধর্মই প্রচার করতে থাকবেন। এ সব বিষয়কে বিবেচনা করেই বদিউজ্জামান বলেছেনঃ

হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত অবস্থায় সশরীরে বেহেশতী জগতে অবস্থান করছেন।

যেহেতু এটা তাঁরই প্রতিজ্ঞা, তাই তিনি অবশ্যই হযরত ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করবেন:

যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই এবং তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তারা যেন ভুলেও সে সম্পর্কে কোন ভুল করবেন না। বরং আল্লাহর শক্তি মাহাত্ম যা তার ওয়াদা তিনি অবশ্যই পালন করবেন। এ ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা রাখবেন। কোরআনে বর্ণিত আছে, "আল্লাহতালা তার ওয়াদা ভংগ করেন না।"

বদিউজ্জামান এ বিষয়টি আমাদেরকে স্মরন করিয়ে দিয়ে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এই দুনিয়ায় মানবীয় আকৃতিতে পুনরায় আগমন করবেন, এটি একটি বাস্তব ও স্থির নিশ্চিত সত্য বিবরণ।

১০। যখন হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করবেন: এটা প্রত্যেকের জন্য জানা জরুরী নয় যে, সবাই তাঁকে সত্যিকার ঈসা (আঃ) হিসাবে জানতে বা চিনতে পারবে। বরং হযরত ঈসা (আঃ) এর নির্বাচিত ও ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ঈমানের আলোকিত জ্ঞানে বুঝতে ও চিনতে সক্ষম হবেন। বিষয়টি স্বপ্রকাশিত নাও হতে পারে। তাই সবাই তাকে তাৎক্ষনিকভাবে নাও চিনতে পারে।

বদিউজ্জামান বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের প্রথম দিকে তাকে খুব কম সংখ্যক লোক চিনতে ও বুঝতে পারবে। তার খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, অনুসারী, মুরীদ, ভক্ত যারা গভীর ঈমানের অধিকারী হবে তারা ঈমানের আলোয় তাকে চিনতে সক্ষম হবেন। সমাজের অন্য কোন সাধারন লোকেরা তাকে নবী হিসাবে চিনতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

প্রকৃত হযরত ঈসা (আঃ) কে হবেন?

হযরত ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন, পবিত্র কোরানের হাদীসের বর্ণনার সাথে যার চেহারা চরিত্র কার্যকলাপ মিলে যাবে এবং এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে পার্থক্যকারী হবে মিথ্যামসীহ বা দজ্জাল।

হযরত ঈসা (আঃ) এর নির্বাচিত ও ঘনিষ্ঠজন

বদিউজ্জামানের এই বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিছু ঘনিষ্ঠ ও নির্বাচিত অনুসারী থাকবেন। যারা হবেন গভীর জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারী। কোন "যৌথ ব্যক্তিত্বের" অধিকারীর অনুসারী ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিরই অনুসারী বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ থাকতে পারে। বদিউজ্জামান এ ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক ছিলেন। এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে, পয়গম্বর ঈসা (আঃ) কোন "যৌথ ব্যক্তিত্ব" হবেন না বরং তিনি হবেন একজন আশীর্বাদপুষ্ট মহান ব্যক্তি, যার অনেক অনুসারী থাকবে এবং তিনি তাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পরিচিতি আমরা কিভাবে লাভ করতে পারব?

কোরান ও হাদীসের প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুবাদ, বিচার–বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে ইসলামী চিন্তাবিদরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যারা যান নাই বরং তাঁকে আল্লাহর সান্নিধ্যে তুলে নেয়া হয়েছে এবং আখেরী জমানায় তিনি পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। এখন প্রশ্ন হলো, যখন তিনি পৃথিবীতে নেমে

আসবেন তখন আমরা কিভাবে হযরত ঈসাকে (আঃ) চিনতে পারব। তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদেরকে তাকে চিনতে সাহায্য করবে।

কোরানের কোন কোন আয়াতে যা কোন কোন সুরায় পয়গম্বরদের জীবনী ও তাঁদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। পয়গম্বরদের সাধারন চারিত্রিক মাধুর্য, প্রকৃত ঈমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও কোরানে বর্ণিত আছে। তাই কোরান ও সুন্নাহর আলোকে প্রকৃত ঈমাদারগণ এই উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমূহ চিহ্নিত করে হযরত ঈসা (আঃ) কে চিনতে সক্ষম হবেন।

কোরানে ঈমানদার লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন,

ঈমানদার হলো তারা, যারা তাদের পারিপার্শ্বিক সব কিছু গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা–গবেষণা করে এবং কোন খুঁটিনাটি বাদ দেয় না। সকল কিছুর গোপন বা অর্ন্তনিহিত তথ্য অনুসন্ধান করে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহতালা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী জ্ঞান তার প্রিয় বান্দাকে দান করেন। যারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করে ও আল্লাহকে ভয় করে।

(আল ফুরকান)

হে মোমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে ন্যায়–অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন। তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্‌ অতিশয় মংগলময়।

(সুরা আনফল– ২৯)

হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের সময় যারা তাঁকে চিনতে পারবেন, তারা হবেন প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান ঈমানদার, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী, তারা সবকিছু সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে। এ প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান সাইয়েদ নুসরী বলেন, বস্তুত, হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরনের পর তিনিই যে, প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ) এটি শুধু তারাই বুঝতে পারবেন, যাদের ঈমনের আলো অত্যন্ত প্রখর। সবাই তাঁকে চিনতে সক্ষম হবে না।

হযরত ঈসা (আঃ) এর কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখে চেনা যাবে:

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আমরা প্রথমে পবিত্র কোরানে পয়গম্বরদের যে সব গুনাবলী বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে সে সব সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যদিও পবিত্র কোরানে পয়গম্বরদের অনেক বৈশিষ্ট উল্লেখ আছে, আমরা এখানে শুধু সেই বৈশিষ্টসমূহ আলোচনা করব যেগুলি খুব প্রাসঙ্গিক ও তাৎক্ষনিকভাবে ঘটবে বা প্রমান পাওয়া যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) তার অসাধারন নৈতিক মূল্যবোধের জন্য তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে:

আল্লাহতালা সকল পয়গম্বরদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অসাধারন নৈতিক চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ দিলেন। ঈসা (আঃ) ছিলেন তার সমাজের একটি বিরল উদাহরণ। তিনি আলাহ্‌র প্রতি নিবেদিত বলিষ্ঠ, সাহসী ব্যক্তি, একজন প্রকৃত ইমানদার ও আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান।

তাঁর এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমূহের অধিকারী হওয়ায় তিনি তার অনুসারীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতেন। তার এই উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা সকল পয়গম্বরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মর্মে কোরানে উল্লেখ আছেঃ

আর ইহা আমার যুক্তি প্রমাণ, যাহা ইব্রাহীমকে দিয়াছিলাম, তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়া ছিলাম, পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সোলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও আর এভাবেই সৎকর্ম পরায়নদিগকে পুরস্কৃত করি। এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে সৎপথে পরিচালিত কার্যাছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পারিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাইল আল ইয়াসায়া ইউনুস ও লূতকো এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম। বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে, এবং ইহাদের পিতৃ পুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে। আমি তাহাদিগকে মনানীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহা আলাহর হিদায়েত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন।

(সুরা আনআম– ৮৩–৮৮)

ইব্রাহীম এক উম্মত, আলাহর অনুগত এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না

(সুরা নাহল– ১২০)

স্মরন কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। তাহারা ছিল শক্তিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী

(সুরা বাদ– ৪৫)।

অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত বান্দা

(সুরা সাদ– ৪৭)

আমি অবশ্যই দাউদ ও সোলেমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়ে বলিয়াছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মোমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন

(সুরা নমল– ১৫)

এই রসুলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে, যাহার সহিত আলাহ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মরিয়ম তনয়, ঈসাকে স্পষ্ট প্রমান প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি।

(সুরা বাকারা– ২৫৩)

হযরত ঈসা (আঃ) এর চেহারার অভিব্যক্তি দেখেই তাকে চিনা যাবে কারণ যা শুধু পয়গম্বরদের মধ্যেই দেখা যায়।

আলাহতালা কোরানে বলেন যে, তিনি যাদের নির্বাচিত করেছেন, তারা অন্যদের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তিতে অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

নবী বলিল, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আলাহ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময় (সুরা বাকারা– ২৪৭)।

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চারিত্রিক চেহারায় মাধুর্য সম্পন্ন হযরত ঈসা (আঃ) এর চেহারায় এমন অভিব্যক্তি দেখা যাবে যা শুধু পয়গম্বরদের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর খোদাভীরুতা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও তার ঈমানের আলোর দীপ্তি মুখমন্ডলে বিরাজ করবে। তাঁর এই বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তি অন্যান্য লোকদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যাবে। সাধারন লোক তাকে দেখা মাত্র তার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারবে যে, তারা একজন অতি অসাধারন, মহান ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়েছে। কেহ কেহ ক্রোধ বা অহংকার বশে কোন কোন ব্যক্তি এই মহান পয়গম্বরের এই উন্নত বৈশিষ্ট সমূহ সাময়িকভাবে গুরুত্ব নাও দিতে পারে। তবে তাদের অন্তরের অন্তস্থলে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকবে।

আলাহতালা সুরা আনআমে হযরত ঈসা (আঃ) এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলেছেনঃ

তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্যতম হবেন

(সুরা আনআম– ৪৫)

৩। তিনি অসাধারন প্রজ্ঞা ও অসামান্য বাকগম্বর হবেন ঃ

আমি উহাদিগকেই কিতাব কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছি

(সুরা আনআম– ৮৯)

আলাহতালা তাঁর বাণী ও ঐশী নির্দেশাবলী পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। তিনি তাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সাথে অসাধারন বাগ্মীতা দান করেছেন। সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ করার উদাহরণ সব পয়গম্বরের সাধারন বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহতালা এছাড়াও এক একজন পয়গম্বরকে ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট দান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

(সুরা সাদ– ২০)

হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা।

(সুরা মরিয়ম–১২–৩)

হযরত মুসা (আঃ) এর বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

যখন মুসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম।

(সুরা কাসাস–১৪)

হযরত লোকমান (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(সুরা লোকমান– ১২)

আল্লাহ বলেন, আমি ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছি।

(সুরা নিসা– ৫৪)

হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, স্মরন কর! আল্লাহ বলেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরন কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও

পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে, তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়াছিলাম।

(সুরা মায়িদা– ১১০)

ঈসা যখন স্পষ্ট নির্দশন সহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ। তাহা স্পষ্ট করায় দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরন কর।

(সুরা যুখরুফ– ৬৩)

আলোচ্য আয়াত সমূহ হতে দেখা যাচ্ছে যে হযরত ঈসা (আঃ) তার বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালকারী, প্রাসঙ্গিক ও হৃদয়গ্রাহী বাকপটুতার জন্য চেনা সহজ হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ফয়সালাকারী বা বাগ্মিতা নবী রসুলদের মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

ঈমানদারগণ, যারা কোরানকে হেদায়েতকারী পুস্তক হিসাবে মানেন তারা এই সত্য জানেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর বাগ্মিতায় যে বিজ্ঞতা থাকবে তা শুধু আল্লাহর নবীদেরই থেকে থাকে। তিনি যে ধরনের জ্ঞানী হবেন, যে ধরনের নির্ভুলভাবে সমস্যা চিহ্নিত করবেন এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধান তিনি প্রদান করবেন, যা দেখে সহজেই বোঝা যাবে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারন গুণের অধিকারী কোন মহান ব্যক্তিত্ব। তাই তার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমনিত হবে।

৪ । তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হবেন:

প্রত্যেক পয়গম্বর যে জনগোষ্ঠির কাছে তিনি প্রেরিত হতেন তারা নিজের পরিচয় হিসাবে উল্লেখ করতেন, আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত রাসুল (সাঃ) (সুরা শুয়ারা– ১০৭) । নবী–রসুলদের এই বিশ্বস্ততা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের

উপর তাদের গভীর মান্যতা ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ধর্মের প্রতি কঠোর অনুগত্যের ফসল। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মকান্ডের জন্য যে সীমারেখা নির্ধারন করেছেন, তারা সেটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করেন। এই সত্য পথ থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হন না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছা বা নির্দেশের কাছে তারা আত্মসমর্পন করেন না। কোরানে বর্ণিত আছে সকল নবী তাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা তাদের অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত মুসা (আঃ) তার জনগোষ্ঠির কাছে নিজের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন:

ইহাদের পূর্বে আমি তো ফিরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহাদের নিকট আসিয়াছিল এক সম্মানিত রসুল। সে বলিল, আল্লাহর বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যার্পন কর। আমি তোমার জন্য এক বিশ্বস্ত রসুল।

(সুরা দুখান– ১৭-১৮)

সাধারনভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠি আল্লাহর নবী রসুলদের এই অসাধারন বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নাই। তাছাড়া তাদের অজ্ঞতাভিত্তিক কলুষিত জীবনযাত্রা পরিহার করার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি এবং রসুল কর্তৃক প্রচারিত সত্য সঠিক ধর্ম প্রতিপালনে তাদের অনীহার কারণে তারা নবী–রসুল (আঃ) প্রতি উদ্ধত আচরন করতে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পর তারা নবী–রসুল (আঃ) এর বিশ্বস্তার বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাকে দীর্ঘ সময় যাবত বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে তাঁকে দাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়, পরে দীর্ঘদিন তাঁকে কারাবাস করতে হয়। আল্লাহতালার ইচ্ছায় যখন নির্ধারিত সময়

আসে, জনগণ তখন তাকে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁকে রাষ্ট্রীয় অর্থ তহবিলের দায়িত্ব প্রদান করে।

রাজা বলিল, ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আস। আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর রাজা যখন তাহার সহিত কথা বলিল, তখন রাজা বলিল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হইলে।

(সুরা ইউসুফ– ৫৪)

হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী জমানায় যখন দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন কোরআনে বর্ণিত এ সকল গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা যাবে। ইহা আল্লাহর একটি অপরিবর্তনীয় স্থায়ী বিধান। তিনি তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য বিখ্যাত হবেন। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। যেমন তিনি অন্যান্য নবী–রসুল (সাঃ) দের ক্ষেত্রে করেছেন। তার এই বিশ্বস্ততা পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে।

৫। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকবেন:

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে, অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী

(সুরা সাফ্ফাত– ১৭১-১৭৩)

অন্য লোকদের হাত থেকে আল্লাহতালা তাঁর পয়গম্বরগণকে সুরক্ষিত রাখেন। তিনি তাদেরকে এমন শক্তি দান করেন, যাতে তারা তাদের শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে পারে এবং তাদেরকে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। আর এই ষড়যন্ত্র করার সময় হোক অথবা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সময়ই হোক না কেন। আল্লাহ সব

সময় তাঁদের রক্ষা ও সমর্থন দিয়ে থাকেন। আলাহ্‌ নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় যে সব ঈমানদারগণ অপেক্ষা করছেন। তাদের জন্য একটি নির্দশন হলোঃ তিনি যা করবেন তাই সফলতার মুখ দেখবে, তার বিচার অথবা তিনি যে পদ্ধতিতে যে কাজই করবেন, সব কিছুই উল্লেখযোগ্য ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কাজ আপাতদৃষ্টিতে জনগণের বিরুদ্ধে গেলেও কিছুদিন পরে ফলাফল বিপরীত দিকে যাবে এবং তা কল্যাণকর হয়ে দেখা দিবে। এ ধরনের ঘটনায় হযরত ঈসা (আঃ) এর বিচারের নির্ভুলতা ও গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় বহন করবে।

আল্লাহ নবীদের কাছে ওয়াদা করেছেন তাদের প্রধান্য ও সফলতা সর্বাবস্থায় বজায় থাকবে। তাই হযরত ঈসা (আঃ) যখন দ্বিতীয়বার আগমন, যখন করবেন তার প্রথম আগমনের চেয়ে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার হবে। কারণ দ্বিতীয় বারের আগমন হবে ইসলামের পতাকা তলে ও বিজয়ীর বেশে। আলাহ্‌র এই ওয়াদা হযরত ঈসা (আঃ) এর মিশনের নিশ্চিত বিজয় ঘোষণা করে।

তাঁর অনুসারীদের কাছে কার্যত: এটা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। ফলে তাদের সংখ্যা ও ঈমানের গভীরতা ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইতোমধ্যে তার শত্রুরাও হযরত ঈসা (আঃ) অসাধারন ব্যক্তিত্ব ও এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হবে। ঈসা (আঃ) এর শত্রুরা যদিও প্রথম দিকে তার প্রতি আল্লাহর এই অনুগ্রহ, দয়া ও আশীর্বাদের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। কারণ তাঁকে তারা তাদের মতই সাধারন মানুষ বিবেচনা করে তাঁর উপর খবরদারি ও বিজয়ী হওয়ার মিথ্যা আশায় থাকবে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ

পরিশেষে আমি আমার রসুলদিগকে এবং মুমিনদিগকেও উদ্ধার করি। এভাবে আমার দায়িত্ব মুমিনদিগকে উদ্ধার করা।

(সুরা ইউনুস–১০৩)

এভাবে আল্লাহতালা বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রকার চক্রান্ত ও অপতৎপরতা অকার্যকর করে দিবেন।

৬। তিনি তার কাজের জন্য কোন পুরস্কার চাইবেন না:

কোরানে বর্ণিত আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ এই পয়গম্বরগণ তাদের কাজের জন্য কারো কাছে কোন পুরস্কার বা পারিশ্রমিক চান নাই। তারা শুধু আলাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করে গেছেন। কোন পার্থিব লাভ, উপকারের তথা কোন ধরনের বিনিময় প্রত্যাশা করেন নাই। কোরানে বর্ণিত আছে ঃ

"হে আমার সম্প্রদায় আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক যাচনা বা আকাংখা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে, তাহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে?

(সুরা হুদ– ৫১)

নবী রসুল (আঃ) এর এই বৈশিষ্ট্য সকলের মধ্যে বিদ্যমান। হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যমন হবে। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহর সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাবেন। তবুও তিনি এ ব্যাপারে কোন পার্থিব লাভ বা লোভের বহু উর্ধে অবস্থান করবেন। অন্যান্য সব নবীর (আঃ) মত তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তারই কাছেই রয়েছে তার পুরস্কার। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সমাজে তিনি এক বিশেষ মর্যাদা ও সুনামের অধিকারী হবেন। তবে স্মরন রাখতে হবে যে, শুধু ঈমানদার ব্যক্তিগণ তার এই চারিত্রিক মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে ও হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। এটাও হতে পারে যে, তাঁর শত্রুরা তাঁকে চিনতে পারিবে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসা–দুর্নাম রটাতে থাকবে। যেমন অতীতে সকল পয়গম্বর এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। আলাহতালা তার ওপর শত্রুদের অভিযোগ ও

দুর্নাম মিথ্যা ও প্রতিপন্ন করবেন যেহেতু আল্লাহতালার নির্দেশই তিনি সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

ঈমানদারদের প্রতি তিনি সহানুভূতি ও দয়ালু হবেন:

পয়গম্বর (আঃ) এর চরিত্রের এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা ঈমানদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও দয়ালু। ঈমানদের প্রতি পয়গম্বরদের এই দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা ঈমানদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকর কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে তাঁর অনুসারী ঈমানদারদের প্রতি তাঁর এই অযাচিত দয়া তাঁর চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহতালা পয়গম্বরদের এই অনন্য বৈশিষ্ট উল্লেখ পূর্বক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন:

অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রসুল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে বা কষ্টদায়ক উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকারী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

(সুরা তওবা– ১২৮)

হযরত ঈসা (আঃ) ও তার অনুসারীদের তথা ঈমানদারদের প্রতি গভীর দয়া ও অনুকম্পা থাকবে। তাঁর এই অসাধারন করুনা ও দয়াদ্র চিত্তই বাস্তবে প্রমান করবে যে, তিনি একজন আলাহ্র অসাধারন পয়গম্বর।

মিথ্যা মসীহদের আগমন বা আবির্ভাবের মাধ্যমেই হযরত ঈসা (আঃ) এ প্রত্যাবর্তনের আগমনী বার্তা ঘোষনা হবে:

হযরত ঈসাকে (আঃ) বিভিন্ন নির্দশনাবলীর মাধ্যমে চেনা সম্ভব হবে। তার সকল কাজই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অনুকরনীয় হবে। তাঁর মধ্যে বিদ্যমান এসব লক্ষনাদি তাকে অন্য লোকদের থেকে আলাদা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করবে। ফলে কোন দৃশ্যমান প্রমান ছাড়াই তাকে পয়গম্বর হিসাবে চেনা যাবে। পক্ষান্তরে, মিথ্যা মসীহ দজ্জাল হযরত ঈসা (আঃ) হিসাবে নিজেদেরকে প্রমানের অপচেষ্টাই প্রমান করবে যে, তারা মিথ্যা দাবীদার বা জালিয়াত জোচ্চোর বা প্রতারক।

হযরত ঈসা (আঃ) এর কর্মকান্ডই তাঁর পরিচিতি বহন করবে। তিনি খোদা বিরোধী সকল মতবাদ, চিন্তাধারা, অশীলতা ও চরিত্রহীনতার সকল কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম করে খোদা অস্বীকারকারীদের পরাজিত ও ধ্বংস করবেন। এসব তার জন্য অতি সহজ হবে। কারণ তাঁর কাজের পিছনে আল্লাহর মদদ ও অলৌকিক ক্ষমতা তথা কুদরত বিদ্যমান থাকবে। তার এই অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি প্রমান করবেন যে, আল্লাহর ধর্ম সত্য এবং ঈমানদাররা অবশ্যই বিজয়ী হবে। আলাহতালার কোরানে উল্লেখ আছে:

উহারা আলাহর নূর ফুৎকারে নিভাইতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার নূর পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত করবেন। যদিও কাফিররা উহা অপছন্দ করে। তিনিই তাহার রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্যদ্বীন সহ, সকল দ্বীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপছন্দ করে।

(সুরা সাফফ ৮–৯)

হযরত ঈসা (আঃ) এর এই পৃথিবীতে কোন আত্মীয়, পরিবার ও পরিচিত বন্ধু থাকবে না:

পবিত্র কোরানে বর্ণিত বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে তাঁকে চেনা যাবে। তার অসামান্য পরিচিতিমূলক উপাদান থাকবে, যার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এর মধ্যে একটি হলো তাঁর কোন আত্মীয় পরিবার পরিজন কিছুই থাকবে না।

পৃথিবীতে এমন কেউ থাকবে না যে, তাঁর শারীরিক অবয়ব, তাঁর চেহারার বৈশিষ্ট্য, গলার স্বর কেহই শুনেই নাই। এর প্রকৃত কারণ হলো যারা হযরত ঈসা (আঃ) কে চিনতেন, তারা ২০০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন বিধায় তাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের সময়ে তাদের কেউ জীবিত না থাকায় পার্থিবভাবে তার পরিচিত বলতে যা বোঝায়, তার ক্ষেত্রে এমন কেহ থাকবে না। হযরত ঈসার (আঃ) পবিত্র মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ), আলাহ্র পয়গম্বর হযরত জাকারিয়া (আঃ), তাঁর অনুসারীবৃন্দ, যারা তাঁর সাথে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন, সেই সময়কার প্রভাবশালী ইহুদি নেতৃবৃন্দ, এমনকি যারা তার নবী হওয়ার কথা শুনেছিলেন, তারা সবই বহুদিন পূর্বে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাই পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয়বার আগমনের সময় এমন কেউই উপস্থিত থাকবেন না যিনি তাঁর জন্ম, শিশুকালে তার বড় হওয়া, তার যুবক বয়স বা বয়:প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে কিছু জানবেন। পূর্বে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে "হও" এই নির্দেশের বলে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই দুই হাজার বছর পর এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই পৃথিবীতে তার কোন আত্মীয়স্বজন থাকবে না। আল্লাহতালা তাঁর সাথে আদম (আঃ) এর তুলনা করে কোরানে বলেছেন ঃ

আলাহ্‌র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার (আঃ) দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন "হও" ফলে সে হইয়া গেল।

(সুরা আল ইমরান– ৫৯)

এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিলেন "হও" সেই অনুযায়ী আদম (আঃ) সৃষ্টি হলেন। হযরত ঈসা (আঃ) অনুরূপভাবে সৃষ্টি হয়েছেন। যদিও তার একজন মাতা ছিলেন। হযরত আদম (আঃ) এর কোন মাতাপিতা ছিলেন না। হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার আগমনের পরও তার কোন পিতা–মাতা থাকবে না। শত শত বছর পর তিনি পৃথিবীতে যখন আসবেন সংগত কারণেই তার কোন আত্মীয় পরিজন বা বন্ধুবান্ধব কিছুই থাকবে না।

হযরত ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন সন্দেহাতীতভাবে তার সত্যিকার পরিচিতি থাকবে না। পক্ষান্তরে মিথ্যা মসীহ হিসাবে যারা নিজেদের দাবী করবে, তাদেরকে অতি সহজেই চেনা যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) কে ছোটবেলা থেকে দেখেছে বা চিনে তার সাথে দীর্ঘদিন এক সংগে কাটিয়েছে পৃথিবীতে এমন কেউ হবে না যে, এ ধরনের দাবী করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

হযরত ঈসার (আঃ) এর পৃথিবীতে পুনরায় আগমন মানব জাতির জন্য অত্যন্ত শুভ সংবাদ ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধের এর বিজয় তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরই সূচিত হবে। তখন তিনি একজন আশীর্বাদ পুষ্ট "ত্রাণকর্তা" হিসাবে বিশ্ব মানবতার নিকট আবির্ভূত হবেন। প্রকৃতপক্ষে যখন সমগ্র বিশ্বে বিশৃংখলা, বিপর্যয় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, মানব জাতি এই গোলযোগ মানবীয় বিপর্যয়ে অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে এই অবস্থা নিরসনের জন্য তাদের কাছে একজন "উদ্ধারকর্তা" বা "ত্রাণকর্তা" প্রেরনের জন্য আবেদন জানাবে। তখন আল্লাহতালা মানব জাতিকে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মানব জাতির এ প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দয়াশীল হয়ে তাদের আবেদন পূরনের লক্ষ্যে হযরত ঈসা কে (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেরণ করবেন ঃ

তোমাদের কি হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না, আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য যাহারা বলে; হে আমাদের প্রতিপালক, এই জনপদ যাহার অধিবাসী যালিম। উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও, তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের "অভিভাবক" ত্রাণকর্তা প্রেরণ করা এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে বর্তমান সময়ে আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কোরানের ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের আত্ম গভীরে প্রবেশ করানো ও মানবসমাজে তা প্রতিষ্ঠা করা। হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের পর তিনি পূর্ন্যোদ্যমে আল্লাহ্‌র বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববাসীকে এই বাণীই পৌঁছে দিবেন।

অদৃশ্য জগতের কথা বলাও ভবিদ্বানী করা বা আগামী দিনের ঘটনাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। তবুও যারা নিশ্চিত যে, এই মহাসুসময় যখন আসবে তখন সে অবশ্য সেই সময়ে কোন বড় ধরনের দায়িত্ব পালন করবে। হযরত ঈসা (আঃ) যেমন সকল ঈমানদারগণকে রক্ষা করবেন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিবেন। অনুরূপভাবে ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহ্যাগিতা প্রদান করতে হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর মত মহান পৃথিবীবাসীর জন্য মহান অতিথিকে স্বাগত না জানানোর মত অলসতা নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আল্লার কোরান বা ঐশীবানীর প্রতি বিশ্বাস আছে, বিশ্বের ঘটনাবলী যে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আখেরী জামানার নির্দেশনাবলী সম্পর্কে সচেতন এমন কোন ব্যক্তিই এই মহামহিমান্বিত অতিথিকে স্বাগতম জানানোর প্রস্তুতি না গ্রহণ করে থাকতে পারবে না।

যারা আল্লাহর নবীদের (আঃ) অনুসারী এবং নবীগণ (আঃ) যে ধর্ম প্রচার করেন তারা অবশ্যই শুধুমাত্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকে সব ধনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে নৈতিকভাবে বাধ্য। আল্লাহ করুনা, দয়া, ক্ষমা ও চিরস্থায়ী বেহেশতের প্রত্যাশা তারাই করতে পারে। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুসংবাদের ওয়াদা ঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ, এক রসুল যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন, যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ন তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, তাহাকে আল্লাহ উত্তম রিযক দান করিবেন।

(সুরা তালাক ১০-১১)